আদায় করিতেছেন।

লোকেরা অনুমানে নামাযের সময় নিরূপণ করিয়া মসজিদে আগমন করিয়া থাকেন– ইহাতে নিশ্চিত অসুবিধা হইতে লাগিল। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত মুসলমানদের সলা-পরামর্শ হইতেছিল। এমতাবস্থায় এক কৌতূহলজনক ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আযান প্রবর্তিত হইল– যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

আযান প্রথা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এক নবযুগের সূচনা করিল। তওহীদের ঘোষণা, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল এই ঘোষণা– যাহা গৃহ প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে বসিয়া শুধু নিজ মুখে উচ্চারণ করিতেও মুসলমাগণ সন্ত্রস্ত থাকিত, নামায আদায় করিতে মুসলমানরা নিজেরাই শত বাধার সম্মুখীন হইত– অপরকে উহার প্রতি আহ্বান করার ত প্রশ্নই ছিল না।

আজ সেই তওহীদের ঘোষণা, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল হওয়ার ঘোষণা, নামাযের প্রতি আহ্বান গৃহভ্যন্তরে নহে, শুধু মুখের উচ্চারণে নহে, শুধু সুযোগ প্রাপ্তিতে নহে– বরং নীতিগতভাবে ও রীতিমত বলিষ্ঠ কণ্ঠে, সর্বোচ্চ স্বরে আকাশে-বাতাসে মিশাইয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রতিদিন পাঁচ পাঁচ বার ঐ ঘোষণা ও আহ্বানের বজ্রনিনাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল। আযানের এই অপূর্ব ধ্বনি তরঙ্গ মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করায় তাহাদের মন-প্রাণ ঝংকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইসলামের গৌরব মুসলমানদের বিজয় ধ্বনির মহাস্বর সেই আযান, যাহা বিশ্বের মিনারে মিনারে আজও ধ্বনিত হইতেছে– হিজরতের প্রথম বৎসরই এই মহাধ্বনি ইসলামের বিধানরূপে প্রবর্তিত হয় এবং আবহমানকালের জন্যই ইসলামের গৌরব ও বিজয় স্মৃতিরূপে চিরায়ত বিধি আকারে সর্বত্র প্রচলিত হয়।

মদীনায় ইসলামের এক নবরূপের আবির্ভাব

মক্কায় সুদীর্ঘ তের বৎসর নবীজীর (সঃ) নীতি ছিল বিধর্মীদের জুলুম-অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া। এক গালে চড় খাওয়া সত্ত্বেও অপর গাল পাতিয়া দিয়াও সংঘর্ষ এড়াইতে হইবে– এই ছিল তাঁহার নীতি। মক্কার পাষণ্ডরা তাঁহার উপর এবং তাঁহার ভক্তগণের উপর কি অমানুষিক অত্যাচারই না করিয়াছে! স্বয়ং নবীজী (সঃ)-কে গালাগালি দিয়াছে, প্রহার করিয়াছে, নানা প্রকারে তাঁহাকে উৎপীড়ন করিয়াছে, সামাজিক বয়কট করিয়াছে, শেষ পর্যন্ত প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছে। মুসলমানদের উপর ত অত্যাচারের সীমাই ছিল না। কিন্তু নবীজীর (সঃ) পক্ষ হইতে প্রতিরোধ বা প্রতিকার ছিল না; নীরবে সহ্য করিয়া চলাই ছিল তাঁহার নীতি। দীর্ঘ তের বৎসরেও এই নীতির সুফল ফলিল না। মক্কার পাষণ্ডরা এই নীতির পাত্র ছিল না। তাহাদের উপর এ সাধু নীতির বিরূপ ক্রিয়া হইল। এই নীতির সুযোগে পাষণ্ডরা জুলুম-অত্যাচারের পরিমাণ দিনের দিন বাড়াইল বৈ কমাইল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানগণ ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি, আত্মীয়-স্বজন বর্জন করতঃ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন। মদীনায় আসিয়া নবীজী (সঃ) অন্য একটি সত্যের প্রতি দৃষ্টি দিলেন যে, নিষ্ক্রিয় সহ্য দুষ্কৃতির প্রশ্রয় দেয়। অতএব অত্যাচারী জালেমকে অবশ্যই সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে হয় এবং যত দিন না তাহার উপর জয়লাভ করা যায় তত দিন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানিয়া চলায় যাহারা বাধার সৃষ্টি করে, আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করা যাহারা অপরাধ গণ্য করিয়া উৎপীড়ন করে, জুলুম-অত্যাচার করে, তাহারা প্রকৃতই জালেম, সত্যের শত্রু। এই জালেমদেরকে দমন করিতে হইবে, এই শত্রুদেরকে বাধা দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে, অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

এই যুদ্ধ নিছক রাজ্য জয়ের জন্য নহে, ডাকাতের মত নিজ স্বার্থ লোভে নরহত্যা ও লুণ্ঠন করার ন্যায় নহে। এই যুদ্ধ মঙ্গলের জন্য, সত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তথা ডাক্তারের মত দেহের শান্তি ও সুস্থতা রক্ষাকল্পে

উহার অবাঞ্ছিত ও দূষিত অংশ অস্ত্রোপচারে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়ার ন্যায়। এই যুদ্ধকেই জেহাদ বলা হয়।

জেহাদে অস্ত্র ধারণ ও অস্ত্র প্রয়োগ আছে বটে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অস্ত্র প্রয়োগ নিন্দনীয় নহে। সত্য ও আদর্শের জন্য, শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র প্রয়োগ অতি মহৎই বটে।

বিশ্ব বুকে সত্য, শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কায় দীর্ঘ তের বৎসর সহ্য সহিষ্ণুতার সাধু নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন; পাত্রের অযোগ্যতা হেতু উদ্দেশ্যের সফলতায় প্রতিষ্ঠা তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। মদীনায় আসিয়া নবীজী (সঃ) ঐ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠায় জেহাদের বলিষ্ঠ নীতির প্রতি দৃষ্টি দিলেন।

তাঁহার এই নীতি পরিবর্তনের সূচনায় আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিত এবং পরিপূর্ণ সমর্থনও ছিল অতি সুস্পষ্ট। মদীনায় হিজরত এবং প্রবাসীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা মোটামুটি শৃঙ্খলায় আসার পর পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۔ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۔

অর্থ ঃ (মুসলিম জাতি) যাহারা (এক আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি দানের অপরাধে পথে ঘাটে) আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহাদেরকে সংগ্রাম করার অনুমতি প্রদান করা হইল। কারণ, তাহারা অত্যাচারিত। নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে জয়ী করিতে সক্ষম। তাহাদেরকে অন্যায়রূপে তাহাদের ঘড়-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে শুধুমাত্র এই কারণে যে, তাহারা বলে, আমাদের প্রভু এক আল্লাহ। (পারা–১৭, রুকু–১২)

মুসলমানদের নীতি পরিবর্তনের আহ্বানে আরও আয়াত অবতীর্ণ হইল। যথা–

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۔

অর্থ ঃ "আল্লাহর পথে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তবে (কোথাও চুক্তিবদ্ধ থাকিলে তথায় চুক্তির) সীমা লংঘন করিও না। সীমা লংঘনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না।" (পারা–২, রুকু– ৮)

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۔

অর্থ ঃ "আর (যাহারা তোমদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী) তাহাদের যথায় পাও হত্যা কর এবং যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে সেখান হইতে তোমরাও তাহাদেরকে বিতাড়িত কর। আর জানিয়া রাখ, (জুলুম-অত্যাচার, আল্লাহর ধর্মে বাধাদান ইত্যাদি) অপকর্ম হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা বেশী ভয়াবহ। (অতএব যাহারা ঐ শ্রেণীর অপকর্মে লিপ্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমীচীনই বটে।)" ঐ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۔

অর্থ ঃ (আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় যাহারা বাধাদানকারী) তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাইতে থাকিবে যাবত না আল্লাহর দ্বীনে অন্তরায় সৃষ্টি রহিত হইয়া যায় এবং আল্লাহ দ্বীনের প্রাবাল্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (পারা– ২, রুকু– ৮)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۔ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۔ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ ঃ "জেহাদ তোমাদের জন্য অবধারিত কর্তব্য করা হইল, যদিও তোমরা তাহা কঠিন মনে কর। তোমরা যাহা কঠিন গণ্য করিতেছ হয়ত তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত এবং যাহা তোমরা ভাল মনে

করিতেছ হয়ত তাহাতে তোমাদের অমঙ্গল রহিয়াছে। আল্লাহই সব জানেন তোমরা জান না।"
(পারা–২, রুকু–১০)

মুসলমানদের তৎকালীন প্রথম নম্বরের বিপক্ষ মক্কার কাফেরদের চরম উগ্রতাও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নীতি পরিবর্তনকে অপরিহার্য করিয়া তুলিতেছিল এবং পরিবর্তিত নূতন নীতিতে দ্রুত অগ্রসর হইতে বাধ্য করিতেছিল।

মক্কার কাফেররা নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানদিগকে দীর্ঘ দিন যাবত জুলুম-অত্যাচারে কাবু করিয়া রাখিয়াছিল। হিজরতের পর তাহারা দেখিল, শিকার সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হাতছাড়া হইয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ মদীনায় সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, তাহারা তথায় শান্তি স্বস্তির সহিত ধর্মকর্ম পালনের পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছে। যে ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে কোরায়শরা এক যুগ ধরিয়া চেষ্টা-পরিশ্রম করিয়াছে, আজ সেই ধর্ম মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দ্রুত প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই সব সংবাদে তাহাদের শয়তানী ক্রোধ শত গুণে বাড়িয়া গেল। তারপর এই সংবাদও তাহারা অবগত হইল যে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মদীনার মুসলমান, মক্কার প্রবাসী মুসলমান, এমনকি ধনে-জনে পুষ্ট মদীনার ইহুদীদিগকে লইয়া এক আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। উক্ত সনদের একটি বিশেষ অনুচ্ছেদে কোরায়শ এবং তাহাদের মিত্রদের প্রতি বৈরী হওয়ার উপর মদীনার সকল সম্প্রদায়কে সম্মত করাইয়াছেন। মদীনার সকল সম্প্রদায়কে এক বিশেষ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাইয়া আন্তর্জাতিক সন্ধি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যেকোন দেশ মদীনা আক্রমণ করিলে ধর্ম গোত্র নির্বিশেষে সকলে একযোগে সেই আক্রমণ প্রতিহত করিবে। এইভাবে মুসলমানগণ মদীনায় নিজেদের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করিতে সফল হইয়াছে। এখন মদীনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হেস্তনেস্ত, বিধ্বস্ত করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এইসব শুনিয়া ও ভাবিয়া কোরায়েশরা ক্ষোভে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একদিকে মুসলমানদের শান্তি লাভের উপর ক্ষোভ ক্রোধ, অপর দিকে তাহাদের শক্তি সঞ্চয়ের উপর আতঙ্ক।

নরাধমরা নবীজী (সঃ) ও তাঁহার সহচরবর্গের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, এখন তাহা তাহাদের স্মরণ পথে উদিত হইতে লাগিল এবং অন্তরে আতঙ্ক উঁকি দিল যে, মুসলমানগণ এইভাবে আরও কিছু শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়াস পাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের পরিণাম কত শোচনীয় হইতে পারে।

তাহাদের আতঙ্কের আর একটি বিশেষ কারণ ত অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। মক্কা এলাকা উৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম; বাণিজ্যই হইল ঐ এলাকার লোকদের একমাত্র জীবন সম্বল এবং সিরিয়ার বাণিজ্যই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। আর মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথটি মদীনাবাসীদের বাগে রহিয়াছে। ঐ পথে চলাচলকারীদের বাণিজ্যসম্ভার লুণ্ঠন করা এবং মক্কাবাসীদের এই বাণিজ্য পথ বন্ধ করা মদীনাবাসীদের পক্ষে অতি সহজ। মক্কাবাসীরা মুসলমানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের সহিত যে শত্রুতা স্থাপন করিয়াছিল, তাহাও তাহারা উত্তমরূপে অবগত ছিল। সুতরাং মদীনায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা লাভ মক্কার কাফেরদের জন্য মৃত্যু পরোয়ানা। এই সকল চিন্তা ও উদ্বেগ কোরায়শদের ক্ষোভ আতঙ্ক অগ্নির মাঝে কেরোসিনের কাজ করিল। শিকড় জমাইয়া অজেয় হইবার পূর্বেই কাল বিলম্ব না করিয়া মুসলমান জাতিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য তাহারা উন্মাদ হইয়া উঠিল। এমনকি মদীনা আক্রমণে মুসলমানদিগকে তথা হইতে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনায় নানা রকম চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল এবং উস্কানিমূলক কার্যে উগ্রমূর্তি ধারণ করিল। কোরায়শদের ষড়যন্ত্র চক্রান্ত কত মারাত্মক ছিল, একটি নমুনা লক্ষ্য করুন–

রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং মুসলমানগণ মক্কায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া মদীনায় আসিয়াছিলেন। এখানেও তাঁহারা যেন আশ্রয় না পান, মক্কার দুরাচাররা সেই ফিকিরে লাগিয়া গেল। ইহার সুযোগ লাভের অবকাশও মদীনায় ছিল। এই সময় মদীনায় খাযরাজ বংশীয় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী

মোশরেক ছিল। সমগ্র মদীনায় তাহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এমনকি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্ব মূহূর্তে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আবদুল্লাহই মদীনার শাসক ও প্রধান নিযুক্ত হইবে। অচিরেই তাহার শিরে পরাইবার জন্য রাজমুকুটও তৈয়ার হইতেছিল; কিন্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় পদার্পণে ঐসব পরিকল্পনা বানচাল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে স্বাভাবতই তাহার ক্রোধ পড়িয়াছে নবীজীর (সঃ) উপরে। এই সংবাদ কোরায়শদের অবিদিত ছিল না এবং তাহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেও মোটেই বিলম্ব বা ত্রুটি করিল না। তাহারা আবদুল্লাহ এবং তাহার দলস্থ মোশরেক-পৌত্তলিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে উত্তেজিত করিয়া আবদুল্লাহর নিকট গোপন পত্র প্রেরণ করিল। যাহার মর্ম এই ছিল–

"তোমরা (আমাদের ধর্মাবলম্বী হইয়াও) আমাদের পরম শত্রু ব্যক্তিকে তোমাদের দেশে আশ্রয় দিয়াছ। হয় তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেল, না হয় তোমাদের দেশ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দাও। অন্যথায় আমরা নিশ্চয় আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিব এবং তোমাদের যুবক দলকে হত্যা করিব, তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে ছিনাইয়া নিয়া আসিব।"

আবদুল্লাহর নিকট এই পত্র পৌঁছিলে সে অতি উৎসাহী হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহে তৎপর হইল এবং নবীজীর (সঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি করিল।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বয়ং আবদুল্লাহ এবং তাহার দলের লোকদের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, দেখিতেছি কোরায়শদের চাল তোমাদের উপর বেশ চলিয়া গিয়াছে, তোমরা তাহাদের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছ। তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, কোরায়শরা আক্রমণ করিলে তাহারা তোমাদের যে ক্ষতি করিবে– তাহাদের উস্কানিতে তোমরা যাহা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, তাহার ফলে তোমাদের নিজেদের হাতে নিজেদের ক্ষতি তদপেক্ষা তিল পরিমাণও কম হইবে না। মুসলমানদের মধ্যে তোমাদের পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে। অতএব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে তোমাদেরই সেই পুত্র, ভ্রাতা ও স্বজনরা মারা পড়িবে। নবীজীর (সঃ) এই যুক্তিপূর্ণ উক্তির প্রভাবে আবদুল্লার দলের মধ্যে মত পরিবর্তনের হিড়িক পড়িয়া গেল, তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আবদুল্লাহও নীরব থাকিতে বাধ্য হইল।

কোরায়শদের এই সব ষড়যন্ত্র এবং উস্কানির মুখে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় বসিয়া থাকা নবীজীর (সঃ) পক্ষে সমীচীন ছিল– কোন পাগলও ইহা ভাবিতে পারে না। কর্তব্যের খাতিরেই নবীজীকে সক্রিয় হইতে হইল। অত্যাচারী জালেম শক্তিকে শক্তি দ্বারা বাধা দানের বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিতে হইল। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে বাধা দানকারীদের বাধা অপসারণে তাহাদিগকে দমাইবার জন্য শক্তির মোকাবিলায় শক্তি প্রয়োগের নীতিতে নবী (সঃ) অগ্রসর হইলেন– ইহাই বলিষ্ঠ জাগ্রত জীবনের লক্ষণ বটে। সসম্মানে জাতিগতভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই নীতি অপরিহার্য। যত দিন না ইহাতে জয়লাভ হয় তত দিন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়। নবীজী মোস্তফা (সঃ) মদীনার জীবনে সেই সংগ্রামেই অবতীর্ণ হইলেন।

চির শত্রু মক্কার দস্যুদের উস্কানির প্রতিরোধে প্রথম প্রথম ছোট ছোট অভিযান পরিচালিত হয়, যাহার ফলে বড় বড় যুদ্ধের সূচনা হইয়া পড়ে। নবীজীর (সঃ) দশ বৎসর জেহাদী জীবনের বেশীর ভাগ জেহাদ এই অনুক্রমেই ছিল।

এতদ্ভিন্ন ইহুদী জাতি, যাহারা স্বভাবতই ক্রুর কুটিল, তাহারাও ইসলামের উন্নতিতে এবং মদীনায় তাহাদের দীর্ঘ দিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব হইতে থাকায় সহাবস্থান চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অশান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কতিপয় জেহাদের সূচনা হয়। এইভাবে মদীনায় নবীজীর (সঃ) দশ বৎসরের জীবনে তাঁহাকে কতগুলি যুদ্ধ-জেহাদে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী আলোচনায় সেই সব জেহাদের বিবরণ এক বিশেষ অধ্যায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। বাস্তবিকই তাহা এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়। মুষ্টিমেয় সংখ্যার জামাত অতি

নগণ্য সম্বল লইয়া যেভাবে বিদ্যুৎ গতিতে জয়লাভ করিয়া যাইতে থাকে, তাহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, জেহাদগুলি প্রকৃতই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা ও ইসলামের সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল।

মূল বোখারী শরীফে ৫৬৩ হইতে ৬৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সেই সব জেহাদের বিবরণ বর্ণিত আছে। বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ডে প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী উহার অনুবাদ রহিয়াছে এবং অধ্যায়টির ভূমিকায় জেহাদ সম্পর্কে এবং জেহাদে অবতরণের সূচনায় নবীজীর (সঃ) প্রজ্ঞাময় বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী সঙ্কলনে ঐ সব জেহাদের বিবরণদান অবশ্যই অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু আমাদের তৃতীয় খণ্ডে সেসব বিষয় সম্বলিত হাদীছের অনুবাদ হইয়া যাওয়ায় বর্তমান খণ্ডে আমরা আলোচনা হইতে বিরত হইয়াছি। আমরা হিজরী সালগুলির ঘটনাবলী আলোচনায় ঐ জেহাদসমূহের শুধু নাম উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড হইতে উদ্ধার করার জন্য পাঠক সমীপে অনুরোধ রহিল।

হিজরী প্রথম বৎসর

এই সালে নবী (সঃ) তিনটি অভিযানের ব্যবস্থা করেন। অভিযানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল এবং নবী (সঃ) সঙ্গে থাকেন নাই। সর্বপ্রথম অভিযানটি পরিচালিত হয় হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে, দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয় ওবায়দা ইবনুল হারেস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে, তৃতীয় অভিযান পরিচালিত হয় সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে।

হিজরী দ্বিতীয় বৎসর

এই বৎসর সর্বপ্রথম নবী (সঃ) স্বয়ং জেহাদ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বপ্রথম অভিযান ছিল– গযওয়া আবওয়া বা ওদ্দান। পর পর এইরূপ আরও তিনটি অভিযান স্বয়ং নবী (সঃ) কর্তৃক পরিচালিত হয়– গাযওয়া বাওয়াত, গাযওয়া ওসায়রা ও গাযওয়া সাফওয়ান।

এই বৎসরই নবীজী (সঃ) মক্কার দস্যুদের বিরুদ্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক রণকৌশল জোরদার করার জন্য আর একটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মক্কা এলাকার ভিতরে গোয়েন্দা দল পাঠাইয়া শত্রুদের গমনাগমন ও তাহাদের খবরাখবর গোপনে অবগত থাকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে গোয়েন্দা দল প্রেরিত হয়।

কেব্‌লা পরিবর্তন

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বলিয়াছেন–

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ـ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরাপুরিভাবে ইসলামের আওতাভুক্ত হও।"

পরিপক্ব ও পরিপূর্ণ ঈমান-ইসলাম আন্তরিক বিশ্বাস ও দৈহিক আমল ভিন্ন আর একটি সূক্ষ্ম জিনিসের দাবী করে। সেই জিনিসটি হইল মানসিক পরিবর্তন। ঈমানে মোফাস্সাল কালেমার বিষয়বস্তুগুলির প্রতি অটুট বিশ্বাস স্থাপন এবং পূর্ণ শরীয়তের ফরয, ওয়াজিব, হালাল-হারাম অনুযায়ী সমুদয় আমল সম্পাদন। এর পরেও পরিপক্ক ঈমান ইসলামের আর একটি দাবী থাকে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের তথা ইসলামী

শরীয়তের মানসিক গোলামী। অর্থাৎ নিজের মন-মানস চিত্ত ও অভিলাষকে আল্লাহ ও রসূলের পূর্ণ অনুগত বানাইয়া নেওয়া যে, ভিন্ন ধর্মীয়, ভিন্ন রীতির বা ভিন্ন পরিবেশের কোন প্রকার প্রভাব বা আকর্ষণ তাহার মানস অভিলাষকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করিতে না পারে। এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে এই হাদীছে উল্লেখ আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন–

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنُ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের কেহ পরিপক্ব ঈমানদার সাব্যস্ত হইবে না যাবত না তাহাদের মানস অভিলাষ পূর্ণ অনুগত হইয়া যায় ঐ জীবনব্যবস্থার, যাহা আমি বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছি।"

ছাহাবায়ে কেরামগণকে আল্লাহ তাআলা সর্বদিক দিয়া পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়া পূর্ণ পরিপক্ব মোমেন-মুসলিমরূপে গড়িয়াছিলেন। ভীষণ দুর্যোগ দুর্ভোগের প্রলয়ঙ্করী কম্পন তাঁহাদের উপর বহাইয়া তাঁহাদের ঈমান ও ইসলামকে পরীক্ষা করা হইয়াছে–

مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا ـ

অর্থ ঃ "দুর্যোগ, দুর্ভোগ ও বিভীষিকাপূর্ণ নির্যাতন তাঁহাদিগকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল।"

(কোরআন শরীফ)

অর্থ ঃ ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন সর্বস্ব ত্যাগপূর্বক হিজরতের দ্বারাও তাঁহাদের পরীক্ষা করা ইয়াছিল। এইভাবে ঈমান ও ইসলামের পরীক্ষার সেলসেলায় অনেক বিষয়ের দ্বারা আল্লাহ তাআলা ছাহাবীগণের মানসিক পরিবর্তনের পরীক্ষাও করিয়াছেন। সব রকম পরীক্ষায়ই ছাহাবীগণ উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন এবং সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তবেই ত তাঁহারা ইসলামের এত দূর উন্নতি সাধনে কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন এবং স্বয়ং আল্লাহর রসূল কর্তৃক তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি আদর্শ হওয়ার যোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন–

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ ـ

অর্থ ঃ "আমার ছাহাবীগণ (ইসলামের ও ঈমানের পথে দিশারী হওয়ায়) উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ, তাঁহাদের প্রতিজনের অনুসরণই তোমাদিগকে সত্য পর্যন্ত পৌছাইবে।"

মানসিক পরিবর্তনের পরীক্ষায় আল্লাহ তাআলা ছাহাবীগণকে কেবলার বিষয় দ্বারা একটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মক্কা হইতে আগত মোহাজের মুসলমানগণ ইসলাম পূর্বকালে নিজেদেরকে কা'বা ঘরের পুরোহিত সেবাইত গণ্য করিয়া নানা কুসংস্কার সৃষ্টি করিয়াছিল। যথা– তাহারা যে বহিরাগতকে বস্ত্র না দিবে সে কা'বার তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ কার্য উলঙ্গ হইয়া সম্পাদন করিবে, হজ্জ আদায় করিতে তাহারা আরাফার ময়দানে যাইবে না ইত্যাদি।

কা'বা শরীফের ভক্তি ভাল জিনিস, কিন্তু সেই ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বহু অনাচারজনিত পৌরোহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল। আর মক্কাবাসীরা এই পৌরোহিত্য জিয়াইয়া রাখার স্বার্থে কা'বা গৃহের ভক্তিতে গদগদ ছিল।

মক্কাবাসী মুসলমানগণ যখন হিজরত করিয়া মদীনায় আসিলেন তখন আল্লাহ তাআলা কা'বা শরীফের বিপরীত দিক বায়তুল মোকাদ্দাসের দিককে কেবলা বানাইবার আদেশ করিলেন। আল্লাহ পরীক্ষা করিতে চাহিলেন আল্লাহর আদেশে কা'বা ছাড়িয়া, কা'বার পুরোহিতরা কেবলা হওয়ার সম্মান তাহা অপেক্ষা কম মর্যাদার বায়তুল মোকাদ্দাসকে দিতে সন্তুষ্ট চিত্তে রাজি হয় কিনা। দীর্ঘকালের পৌরোহিত্য আল্লাহর আদেশে এইভাবে ক্ষুণ্ন করিয়া রসূলের মারফত দেওয়া আল্লাহর আদেশকে সর্বোচ্চে স্থান দেওয়ার মানসিকতা কাহার ভিতরে কতটুকু সৃষ্টি হইয়াছে– তাহাই আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়া নিতে চাহিলেন। পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই দীর্ঘ ১৬–১৭ মাস পর এই পরীক্ষার সমাপ্তিলগ্নে এই তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন–

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ -

অর্থ ঃ "মদীনায় আসিয়া যেই কেব্‌লার উপর আপনি থাকিলেন তাহার আদেশ একমাত্র এই উদ্দেশে করিয়াছিলাম যে, দেখিয়া নিব- কে রসূলের কথা মানে, কে ফিরিয়া থাকে।" (পারা- ২, রুকু- ১)

পরীক্ষাকাল ১৬ বা ১৭ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই উম্মতের জন্য স্থায়ী কেবলারূপে কা'বা শরীফের দিক নির্ধারিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বৎসরে। কেবলা পরিবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৩৬ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

হিজরী দ্বিতীয় বৎসরেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইসলামের প্রথম মহাসমর বদরের জেহাদ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; যাহার বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

বদর জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের মাত্র এক সপ্তাহ পরেই নবী (সঃ)-কে ছোট একটি অভিযানে যাইতে হয়। স্বয়ং নবীজী (সঃ) এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন; অভিযানটি গাযওয়া বনী সোলায়ম নামে অভিহিত।

তারপর "গাযওয়া ছবীক" নামে আরও একটি অভিযান এই বৎসরই পরিচালিত হয়। ঘটনা এই ছিল যে, বদর যুদ্ধে মক্কার কফেরদের শোচনীয় পরাজয় হইল। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা রক্ষা নিয়া বদর যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। অথচ আবু সুফিয়ান তাহার কাফেলাসহ নিরাপদে মক্কায় পৌঁছিল আর মক্কার সর্দাররা রণাঙ্গনে নিহত হইল। পরাজয়ের শোকাবহ সংবাদ মক্কায় পৌঁছিলে আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করিল, সে স্ত্রী সঙ্গম করিবে না যাবত না মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হইতে প্রতিশোধ লয়।

সেমতে আবু সুফিয়ান দুই শত লোক লইয়া গোপনে মদীনার নিকট অবতরণ করিল এবং ইহুদীদের সাহায্যে দুই জন মদীনাবাসী মুসলমানকে হত্যা করিয়া লুকাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সংবাদ প্রকাশ পাইয়া গেল এবং রসূলল্লাহ (সঃ) স্বয়ং তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্য দ্রুত অভিযান চালাইলেন। আবু সুফিয়ান পূর্বেই পলাইয়া যাইতে সক্ষম হইল। (বেদায়া, ৩-৩৪৪)

এই বৎসরই নবীজীর (সঃ) কন্যা রোকাইয়্যা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন, যিনি ওসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিবাহে ছিলেন। নবীজীর (সঃ) জ্যেষ্ঠা কন্যা যয়নব (রাঃ)- যিনি এত দিন মক্কায়ই ছিলেন, এই বৎসরই তিনি মদীনায় পৌঁছেন। এই বৎসরই ফাতেমা (রাঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আসেন; বিবাহের আক্‌দ পূর্বের বৎসরই হইয়াছিল। (বেদায়া ৩-৩৪৬)

হিজরী তৃতীয় বৎসর

এই বৎসরের প্রথম দিকে ছোট দুইটি অভিযান চালাইতে হয়- গাযওয়া নজদ বা জী আমর এবং গাযওয়া ফুরু।

ইতিমধ্যেই নবীজী (সঃ) এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলেন- এত দিন বহির্শত্রুর সহিত সংগ্রাম ছিল। এইবার মদীনার অভ্যন্তরে প্রকাশ্য শত্রুতা সৃষ্টি হইয়া গেল। মদীনার প্রভাবশালী শক্তিশালী ইহুদী সম্প্রদায় সহাবস্থান ও শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহ এবং নানা প্রকার উস্কানিমূলক উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ ধনবান গোত্র ছিল বনী কায়নুকা, তাহারা স্বর্ণ ব্যবসায়ী ছিল। সর্বপ্রথম এই গোত্রই বিদ্রোহ করে; নবী (সঃ) সাফল্যজনকভাবে তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন। তারপরেই ইহুদীদের আর এক প্রভাবশালী গোত্র বনু নজীর বিদ্রোহ করিল। তাহাদের বিরুদ্ধেও নবী (সঃ) সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিতে সফল হইলেন। অনেকের মতে এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ হিজরী চতুর্থ বৎসরে হইয়াছিল।

তৃতীয় খণ্ডে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিদ্রোহ দুইটির বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে।

এই আভ্যন্তরীণ বিপদের ভিতর দিয়াও নবী (সঃ) বহির্শত্রুর প্রধান কোরায়শদেরকে শায়েস্তা করার এবং তাহাদিগকে দমাইয়া রাখার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা– তাহাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক অবরোধ অব্যাহত রাখেন। সেই সেলসেলায় নবীজীর (সঃ) পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে ছোট একটি অভিযানের ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতে সাফল্য লাভ হয়।

এরই মধ্যে ইহুদীদের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমাইবার ব্যবস্থায় নবী (সঃ) অধিক সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইহুদীদের ধনকুবের কা'ব ইবনে আশরাফ নামীয় ব্যক্তি বিদ্রোহ উস্কাইয়া রাখিতে অত্যধিক তৎপর ছিল এবং মুসলিম জাতির ধ্বংসকল্পে তাহার সমুদয় ধনশক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়োজিত রাখিয়াছিল। বিনা রক্তপাতে তাহাকে হত্যা করাইতে নবী (সঃ) সফল হইলেন।

এই শ্রেণীর আরও এক ইহুদী সওদাগর ছিল আবু রাফে। ধনশক্তি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির সহিত সওদাগরী সূত্রে তাহার বৈদেশিক খ্যাতি, পরিচয় ও মিত্রতা অনেক ছিল। সেও তাহার সমুদয় শক্তি-সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিল। রক্তপাতহীন ব্যবস্থায় তাহাকেও হত্যা করাইতে নবীজী (সঃ) সফল হইলেন।

ইতিমধ্যে ভীষণ বিপদের কালো মেঘ মদীনার মুসলমানদেরকে ঘিরিয়া ধরিল। মক্কার মোশরেকেরা সর্বশক্তি একত্র করিয়া বদর সমরের প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশে তিন শত মাইল অগ্রসর হইয়া মদীনার শহরতলীতে পৌছিল এবং ইসলামের দ্বিতীয় মহাসমর ইতিহাস প্রসিদ্ধ ওহুদের জেহাদ অনুষ্ঠিত হইল যাহার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৎসরই শেষ ভাগে (কাহারও মতে হিজরতের চতুর্থ বৎসর) মক্কার অনতিদূরে রাজী নামক এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

এই বৎসর ওসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত নবী (সঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ)-এর বিবাহ হইয়াছিল। এই বৎসরই হাসান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিজরী চতুর্থ বৎসর

এই বৎসরের প্রথম দিকেই বনু আসাদ নামীয় একটি পৌত্তলিক গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনা আক্রমণের আয়োজন করিল। তাহাদের মধ্য হইতেই এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-কে সেই সংবাদ পৌছাইল। নবীজী মোস্তফা (সঃ) আবু সালামা (রাঃ)-কে নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সেই গোত্রের প্রতি একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন; শত্রুরা পলায়ন করিল।

এই বৎসরের প্রথম ভাগে আর একটি দুঃখজনক ঘটনায় নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রেরিত অনেক জন বিশিষ্ট ছাহাবী প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইতিহাসে তাহা বীরে মাউনার ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। এই বৎসরই স্বয়ং নবী (সঃ) আর একটি অভিযানে নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন; যাহা গাযওয়া জাতুর রেকা নামে প্রসিদ্ধ। (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

এই বৎসরই ইমাম হোসাইন (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৎসরই নবী (সঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-কে বিবাহ কলিয়াছিলেন।

হিজরী পঞ্চম বৎসর

এই বৎসরের সেরা ঘটনা হইল ইসলামের বৃহত্তম মহাসমর খন্দকের জেহাদ। তৃতীয় খণ্ডে সুদীর্ঘ আট পৃষ্ঠাব্যাপী তাহার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত মহাসমর সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মদীনার সর্বশেষ ইহুদী

গোত্র নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতক বনু কোরায়যাকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান পরিচালিত হয়। তাহার বিবরণও তৃতীয় খণ্ডে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

অনেকের মতে এই বৎসরই নবী (সঃ) মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দার আবু সুফিয়ান তনয়া উম্মে হাবীবা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান হন নাই, উম্মে হাবীবা (রাঃ) মুসলমান ছিলেন এবং নিজ স্বামীর সহিত হিজরত করিয়া আবিসিনিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তথায় তিনি বিধবা হইয়া পড়েন। তিনি আবিসিনিয়ায় থাকাবস্থায়ই হযরত নবী (সঃ) তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন এবং সেই দেশের বাদশার ব্যবস্থাপনায় বিবাহ সম্পন্ন হইল। এমনকি বাদশাহ নিজেই তাঁহার মহরানা চারি হাজার দেরহাম আদায় করিয়া দিলেন। বিবাহ সম্পাদনেও বাদশাহই রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উকিল ছিলেন। বিবাহ সম্পাদনের পরে তাঁহাকে শোরাহ্‌বীল ইবনে হাসানা (রাঃ) ছাহাবীর তত্ত্বাবধানে মদীনায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। (বেদায়া ৩-১৪৩)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত এই বিবাহের ইঙ্গিত বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছিল। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ـ

"অচিরেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভালবাসার একটি সূত্র সৃষ্টি করিয়া দিবেন।"

মুসলমানদের সর্বপ্রধান ও সর্বেসর্বা ছিলেন নবীজী মোস্তফা (সঃ)। আর মুসলমানদের তৎকালীন প্রধান শত্রু পক্ষ মক্কার কোরায়শদের সর্দার ও সেনাপতি ছিলেন আবু সুফিয়ান। নবীজী (সঃ) এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে এই বিবাহ সূত্রে শ্বশুর জামাতার সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়া গেল। আবু সুফিয়ানের কন্যা মুসলমান জাতির মাতা হইয়া গেলেন। (বেদায়া, ১-১৪৩)

এই বৎসরই নবী (সঃ) যয়নব (রাঃ)-কে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ শুধু আল্লাহর আদেশেই হয় নাই, বরং স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেশতার মাধ্যমে এই বিবাহ সম্পাদনকারী ছিলেন বলিয়া পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনের আয়াত-

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا ـ

অর্থ ঃ "যায়েদ যখন যয়নব হইতে নির্লিপ্ত হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম।" এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়াই বিবাহ সম্পাদন ছিল।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যয়নব (রাঃ) (যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবার পর তিনি) যখন ইদ্দত পূর্ণ করিয়া নিলেন, তখন নবী (সঃ) ঐ যায়েদ (রাঃ)-কেই বলিলেন, তুমি যাইয়া যয়নবকে আমার বিবাহের প্রস্তাব জানাও। সেমতে যায়েদ (রাঃ) যয়নবের নিকটে আসিলেন; তখন যয়নব (রাঃ) রুটি পাকাইবার জন্য আটা তৈয়ার করিতেছিলেন (ঐ সময় পর্দার মাসআলা ছিল না)।

(যয়নব (রাঃ) যায়েদেরই দীর্ঘ দিনের স্ত্রী ছিলেন; তবুও যায়েদ (রাঃ) বলেন-) আমার অন্তরে যয়নবের সম্মান ও শ্রদ্ধার এত বড় ভাব উপস্থিত হইল যে, আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলাম না এই কারণে যে, নবী (সঃ) তাঁহাকে বিবাহে গ্রহণ করার আলোচনা করিয়াছেন। সেমতে আমি তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠ দানে বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বলিলাম, আপনি মহাসুসংবাদ গ্রহণ করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আপনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিয়া পাঠাইয়াছেন।

যয়নব (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার মহান প্রভু-পরওয়ারদেগারের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে কিছু করিব না। এই বলিয়া তিনি তাঁহার নামায কক্ষে যাইয়া দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যেই পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল

হইয়া গিয়াছে যাহাতে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– "যায়েদ যখন যয়নব হইতে নির্লিপ্ত হইয়া গেল তখন আমি যয়নবকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম।" এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর রসূলুল্লাহ (সঃ) যয়নবের কক্ষে অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই তশরীফ নিয়া গেলেন। অতপর বিবাহের ওলীমা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লোকজনকে দাওয়াত করিলেন। (মুসলিম শরীফ, বেদায়া ৩–১৪৬)

বোখারী শরীফেরই এক হাদীছে বর্ণিত আছে, যয়নব (রাঃ) নবীজীর (সঃ) স্ত্রীগণের উপর গর্ব করিয়া বলিতেন, আপনাদের বিবাহ সম্পাদন করিয়াছেন আপনাদের আত্মীয়গণ। পক্ষান্তরে আমার বিবাহ সম্পাদন করিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সপ্ত আকাশের উপরে।

এই বিবাহের ওলীমা লগ্নেই পর্দা ফরয হওয়ার আদেশ কোরআনে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

হিজরী ৬ষ্ঠ বৎসর

এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য প্রথম ঘটনা জী-কারাদের অভিযান। এই অভিযানের সূচনায় অতি মজার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার বিবরণ ৩য় খণ্ডে রহিয়াছে। ১১৫০৭নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা গযওয়া বনী মোস্তালেক বা মোরায়সী অভিযান। এই জেহাদটির তারিখ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রাঃ) দুইটি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন– হিজরী চতুর্থ বৎসরে হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে এবং ষষ্ঠ বৎসরের অভিমতই প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন।

"খোযাআ" গোত্রের একটি শাখা বংশ বনী মোস্তালেক; "মোরায়সী" নামক একটি ঝর্ণার নিকট খোযাআ গোত্রের বস্তি ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) এই মর্মে সংবাদ পাইলেন যে, বনী মোস্তালেকদের সর্দার হারেস লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিতেছে মদীনা আক্রমণ করার জন্য। নবী (সঃ) একজন ছাহাবীকে তথায় প্রেরণ করিয়া সংবাদটির বাস্তবতা তদন্ত করাইলেন। সংবাদটি সত্য প্রমাণিত হইল; তাই নবী (সঃ) তাহার প্রতিকারে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। মুসলমানদের প্রথম আক্রমণেই শত্রু দল পরাজিত হইল; অনেকে পলাইয়া গেল এবং বহু সংখ্যক বন্দী হইল।

বন্দীদের মধ্যে বংশপতি হারেসের দুহিতা "জোআয়রিয়া"ও ছিল। জোআয়রিয়া নবীজীর (সঃ) শরণাপন্ন হইয়া ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিলেন এবং নিজের পরিচয়ও দিলেন যে, আমি বংশের সর্দার হারেসের কন্যা। তাঁহার অবস্থাদৃষ্টে নবীজীর (সঃ) মহানুভব অন্তর দয়ায় উথলিয়া উঠিল। নবীজী (সঃ) তাঁহাকে চির গৌরবের আশ্রয় দানে চরম ভাগ্যবতী বানাইয়া দিলেন যে, তাঁহাকে নিজ দাম্পত্যে স্থান দান করিয়া বিশ্ব মুসলিমের জননী বানাইয়া দিলেন।

এই জেহাদে মোস্তালেক বংশের অনেক নর-নারী বালক-বালিকা বন্দী হইয়া আসিয়াছিল। অবিলম্বে মদীনায় এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে, নবীজী (সঃ) এক মহা উদারতার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, বিজিত বনী মোস্তালেক বংশের সর্দার হারেসের বন্দিনী দুহিতার পাণি গ্রহণে তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন। তখন মুসলমানগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, বনী মোস্তালেক বংশের লোকগণ এখন হযরতের শ্বশুরকুল, সুতরাং ইহাদিগকে আর দাস-দাসীরূপে রাখা সঙ্গত হইতেছে না। নবীজীর (সঃ) সহধর্মিণী মাত্রই মুসলমানদের মাতা, অতএব জননী জোআয়রিয়ার বংশের সমস্ত লোকই এখন মুসলমানদের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন। মদীনার মুসলমানগণ কালবিলম্ব না করিয়া বনী মোস্তালেকের সমস্ত বন্দী দাস-দাসীদেরকে মুক্তি দিয়া দিলেন।

এই অভিযান কতিপয় ঘটনার দরুন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। হাদীছে তফসীরে এবং ইতিহাসে ঐসব ঘটনার আলোচনায় এই অভিযানের উল্লেখ আসিয়া থাকে।

প্রথম ঘটনা ঃ মদীনার অধিবাসীদের একটি শ্রেণী ছিল মোনাফেক– কপট মুসলমান। বস্তুতঃ তাহারা

ইসলাম ও মুসলমানদের পরম শত্রু, কিন্তু আতঙ্ক, স্বার্থ-লোভ কিম্বা ষড়যন্ত্রের উদ্দেশে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে এবং মুসলমানদের দলে মিশিয়া থাকে।

আলোচ্য অভিযানে ঐ শ্রেণীর শয়তানদের বড় সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যোগদান করিয়াছিল। মুসলমানদের সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা, মোহাজের ও আনসারগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া ইত্যাদি শত্রুতামূলক কাজের সুযোগ সন্ধানে তাহারা সদা তৎপর থাকিত। এ অভিযানে একদা পানি সংগ্রহ করিতে ভিড় হয় এবং একজন মোহাজের ও একজন আনসারের মধ্যে বিবাদ হয়। সেই সুযোগে মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ উস্কানি এবং উত্তেজনামূলক কথাবার্তা ছড়াইতে লাগিল। তাহার সম্মুখে তাহার দলের কতিপয় লোক সমবেত ছিল। তাহাদের মধ্যে খাঁটি মুসলমান এক যুবক যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সম্মুখে মোনাফেক আবদুল্লাহ মোহাজেরগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, তাহারা আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের উপর প্রাধান্য এবং প্রাবল্য দেখায়। তাহাদের ও আমাদের অবস্থা ঐ প্রবাদের ন্যায়– "কুকুরকে মোটা-তাজা বানাও যেন সে তোমাকে খায়।" এই বিদেশীদেরকে তোমরা এক দানা দ্বারাও সাহায্য করিও না; বাধ্য হইয়া তাহারা এদিক সেদিক চলিয়া যাইবে। এইবার মদীনায় যাইয়া দেশবাসী শক্তিশালীরা বিদেশী দুর্বলদের নিশ্চয় বাহির করিয়া দিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি অবাঞ্ছিত কথাবার্তা বলিল এবং লোকদিগকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করিল।

তাহার এইসব কথাবার্তা খাঁটি মুসলমান যুবক যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) শুনিলেন এবং নবীজীর গোচরে আনিলেন। নবীজীর (সঃ) নিকটে ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি মোনানেফ আবদুল্লাহকে হত্যা করার মত প্রকাশ করিলেন। নবী (সঃ) ওমরকে বরিলেন, তাহাকে হত্যা করিলে লোকেরা বলিবে, মুহাম্মদ তাঁহার দলের লোকদেরকেও হত্যা করেন (আবদুল্লাহ ত প্রকাশ্যে মুসলমান দলভুক্ত ছিল)।

মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এই সংবাদ অবগত হইল যে, তাহার কথাবার্তা নবীজীর গোচরে আসিয়াছে। তখন সে নবীজীর (সঃ) নিকট আসিয়া কসম করিয়া ঐসব কথা অস্বীকার করিল এবং বলিল, সে ঐরূপ কথা মুখেও আনে না। উপস্থিত কেহ কেহ নবীজী (সঃ)-কে প্রবোধ দিল যে, যায়েদ ইবনে আরকাম যুবক ছেলে; হয়ত সে বুঝিতে ভুল করিয়াছে। মোনাফেক আবদুল্লাহ অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিল।

মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহর এই জঘন্য ভূমিকা ও কথাবার্তার বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে ২৮ পারায় "মোনাফেকুন" নামের সূরাটি নাযিল হইল। ঐ সূরায় পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

"মোনাফেকেরা আপনার সম্মুখে আসিলে বলে, আমরা মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দেই– নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ ত জানেন, আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন– মোনাফেকেরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী (তাহারা অন্তরে কখনও আপনাকে আল্লাহর রসূল মান্য করে না)। তাহারা মিথ্যা কসমের আড়ালে নিজেদেরকে রক্ষা করিয়া লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীন হইতে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। তাহাদের কার্যকলাপ নিতান্তই জঘন্য। তাহারা মুখে ঈমান প্রকাশ করার পর সেই মুখেই আবার কুফরী কথা বলে; ফলে তাহাদের অন্তরে মোহর লাগিয়া গিয়াছে; তাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না। তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি আপনাকেও আকৃষ্ট করে, তাহাদের মিষ্ট কথা আপনারও ভাল লাগে (কিন্তু তাহাদের এই আকৃতি ও কথার মূলে কোন শক্তি নাই) তাহদের অবস্থা ঐ থামগুলির ন্যায়, যেইগুলি মাটিতে প্রোথিত নহে– শুধু হেলান দিয়া দাঁড় করিয়া রাখা হইয়াছে। (ঐগুলি যতই মোটা-মজবুত হউক, কিন্তু প্রোথিত না হওয়ায় কোন শক্তি নাই; মোনাফেকদের ভাল আকৃতি ও মিষ্ট কথার অবস্থাও তদ্রূপই। যেহেতু তাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাই) তাহারা সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। তাহারা নিছক শত্রু; তাহাদের হইতে সদা সতর্ক থাকিবেন। আল্লাহ তাহাদেরকে ধ্বংস করুন; তাহারা কিভাবে উল্টা পথে চলে।"

এই ভূমিকা বর্ণনার পর আলোচ্য ঘটনায় আবদুল্লাহর বিষাক্ত উক্তিগুলিও আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায়

বর্ণনা করিয়াছেন– যাহা যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ কসম খাইয়া অস্বীকার করিয়াছিল।

উক্ত সূরা নাযিল হইলে পর রসূলুল্লাহ (সঃ) যায়েদ (রাঃ)-কে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছেন।

এখন আবদুল্লাহর ভূমিকা পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার এক ছেলে ছিলেন খাঁটি মুসলমান, তাঁহার নামও আবদুল্লাহ। তিনি নবীজীর নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এইরূপ শুনা যায় যে, আপনি মোনাফেক আবদুল্লাহকে হত্যা করার চিন্তা করিতেছেন; যদি তাহাই হয় তবে আমি তাহার মুণ্ডু কাটিয়া আপনার নিকট উপস্থিত করি। অন্য কেহ হত্যা করিলে হয়ত মানবীয় স্বভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া আমি জাহান্নামী হইতে পারি। রসূলুল্লাহ (সঃ) পুত্র আবদুল্লাহকে বলিলেন, যত দিন সে আমাদের জামাতে মিশিয়া আছে, আমি তাহাকে হত্যা করিতে চাহি না।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এই অভিযানে আর একটি ঘটনা এমন ঘটাইল যাহা তাহার জীবনের সমস্ত অপকর্ম ছাড়াইয়া গেল।

এই ভ্রমণে নবীজীর (সঃ) সহিত মুসলিম জননী আয়েশা (রাঃ)ও ছিলেন। খবিস মোনাফেক আবদুল্লাহ জঘন্য ষড়যন্ত্ররূপে জাতির জননী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নামে মিথ্যা অপবাদ গড়িয়া লোকদের মধ্যে তাহার চর্চা করিল। ইহাতে এক মহা বিভ্রাটের সৃষ্টি হইল। অবশেষে পবিত্র কোরআনে সুদীর্ঘ বয়ান অবতীর্ণ হইয়া মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পবিত্রতা প্রমাণ করিল।

এই ঘটনার সুদীর্ঘ বর্ণনা বোখারী শরীফের হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনশাআল্লাহু তায়ালা ষষ্ঠ খণ্ডে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ফযিলত পরিচ্ছেদে উহার অনুবাদ ও বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

আলোচ্য বৎসরের সর্বশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল "হোদায়বিয়ার সন্ধি"। এই সন্ধির ফলেই মুসলিম জাতি সর্বপ্রথম নিজস্ব সত্তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে এবং ইসলামের জন্য অগ্রাভিযানের সুযোগ লাভ হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে "হোদায়বিয়ার জেহাদ" শিরোনামে ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে।

হিজরী সপ্তম বৎসর

নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কর্মতৎপরতা হিজরতের পরবর্তী বৎসরগুলিতে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে চলিতেছিল। হিজরী ষষ্ঠ বৎসরের যিলহজ্জ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করিয়া নবীজী (সঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সন্ধির দরুন মক্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ হইতে অবকাশ পাইয়াছেন। এই অবকাশে কালবিলম্ব না করিয়া বিশ্বব্যাপী ইসলামের আহ্বান ছড়াইয়া দেওয়ার এক আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করিলেন। বিশ্বের বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজন্যবর্গের প্রতি, বিভিন্ন গোত্রপতি, সমাজপতি এবং বড় বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দূত মারফত ইসলামের আহ্বানে সীলমোহরকৃত লিপি প্রেরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

একদা নবী (সঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, আগামীকল্য সকাল বেলা তোমরা সব আমার সহিত একত্রিত হইবে। সেমতে পরবর্তী দিন ফজরের নামাযে সকলে বিশেষভাবে উপস্থিত হইলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিয়ম ছিল, তিনি ফরয নামাযান্তে কিছু সময় তসবীহ পড়া ও দোয়া করায় মগ্ন থকিতেন। আজ সেই নিয়ম পালন পরে উপস্থিত ছাহাবীবর্গের প্রতি ফিরিয়া মিম্বর পরে দাঁড়াইলেন এবং ভাষণ দানে আল্লাহ তাআলার গুণগান ও প্রশংসা করিয়া সকলকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, আমি তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে বহির্বিশ্বের রাজ-রাজড়াদের প্রতি প্রেরণ করার ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা আমার কথার ব্যতিক্রম করিবে না। আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে কর্তব্য

পালন করিয়া যাইবে। জনগণের কোন দায়িত্ব কাহারও উপর ন্যস্ত করা হইলে যদি সে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টা না করে, তবে আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন।

তোমরা নিজ নিজ কর্তব্যে যাইবে এবং ঐরূপ করিবে না যেরূপ করিয়াছিল ঈসা আলাইহিস সালামের প্রেরিত দূত বনী ইসরাঈলগণ। তাহারা নবীর কথার ব্যতিক্রম করিয়াছিল; নিকটবর্তী স্থানে পৌছিয়াছিল, কিন্তু দূরবর্তী স্থানে যায় নাই।

ছাহাবীগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদিগকে যেকোন আদেশ করেন, যেকোন দেশে প্রেরণ করেন– আমরা আপনার কথার ব্যতিক্রম কখনও করিব না। তখন নবী (সঃ) এক একজনকে একজনের নিকট প্রেরণের জন্য নির্ধারিত করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ গন্তব্য দেশের ভাষাও শিক্ষা করিয়া নিলেন। (তাবাকাত, ১–২৭৪, ৩–২৬৮)

সেমতে ঐ যিলহজ্জ মাসের পরবর্তী সপ্তম বৎসরের প্রথম মাস মহররমেই নবীজী (সঃ) তৎকালীন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের ছয় জন সম্রাটের প্রতি লিপি লিখিলেন এবং ছয় জন দূত একই দিনে প্রেরণ করিয়া এই ব্যবস্থার উদ্বোধন করিলেন।

১। সর্বপ্রথম দূত আম্‌র ইবনে উমাইয়া (রাঃ); তাঁহাকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশে নবীজী (সঃ) দুইখানা পত্র লিখিয়াছিলেন– একখানা পত্রে ইসলামের আহ্বান এবং পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াত লিখিয়াছিলেন। বাদশাহ এই লিপিখানা হস্তে ধারণ পূর্বক শ্রদ্ধার সহিত উভয় চোখে স্পর্শ করিলেন এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর কালেমা শাহাদত পাঠে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আক্ষেপের সহিত বলিলেন, সক্ষম হইলে অবশ্যই আমি নবীজী (সঃ) সমীপে উপস্থিত হইতাম।

অপর পত্রে লিখিয়াছিলেন, মক্কা হইতে যাঁহারা হিজরত করিয়া আবিসিনিয়ার আশ্রয় নিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বাহনের ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য। এই পত্রের আদেশও তিনি উত্তমরূপে পালন করিয়াছিলেন। দুইটি নৌকাযোগে তিনি তথাকার প্রবাসী ৮০ জন নারী-পুরুষ মুসলমানকে মদীনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দলপতি জাফর রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হস্তে নবীজী (সঃ) সমীপে লিপির উত্তরও পাঠাইয়াছিলেন– তাহাতে নিজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লিখিয়াছিলেন। (ঐ ২৫৯)

২। তৎকালীন সর্ববৃহৎ শক্তি রোমের সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন দেহইয়া কল্‌বী (রাঃ) মারফত। এই লিপির বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৬ নং হাদীছে রহিয়াছে।

৩। তৎকালীন দুই বৃহৎ শক্তির দ্বিতীয় পারস্য সম্রাটের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে হোযায়ফা (রাঃ) মারফত। লিপির মর্ম ছিল–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى كِسْرٰى عَظِيْمِ فَارِسَ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَاٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا اَسْلِمْ تَسْلَمْ فَاِنْ اَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوْسِ ـ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের তরফ হইতে পারস্য প্রধান কেসরার নিকট– সালাম তাহাকে যে সত্যের অনুসরণ করে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলকে বিশ্বাস করে। আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নাই এবং আমি আল্লাহর রসূল সমগ্র বিশ্ব মানবের প্রতি– সকল জীবন্তদিগকে সতর্ক করার জন্য। ইসলাম গ্রহণ করুন; শান্তিতে থাকিবেন, যদি আপনি ইসলামকে অস্বীকার করেন তবে আপনার প্রজা সমস্ত অগ্নিপূজকরাই অস্বীকার করিবে, ফলে সকলের পাপের জন্য আপনি দায়ী হইবেন। (সীরাতুন নবী)

মহাপ্রতাপশালী পারস্য সম্রাট– যাহাকে তাহার প্রজা ও অধীনস্থগণ পূজনীয় প্রভু গণ্য করিত এবং সকলেই তাহার সম্মুখে অবনত মস্তকে সেজদা করিয়া থাকিত; তাহার নিকট কেহ কোন লিপি পেশ করিলে তাহাতে সর্বপ্রথম সকলের উপর তাহার নাম লেখা অবশ্য কর্তব্য ছিল। তাহার নামের পূর্বে কোন কিছু লেখা মহা অপরাধ গণ্য করা হইত। সেমতে এই লিপিতে যখনই সে দেখিল, তাহার নামের উপরে প্রথম আল্লাহর নাম তার পর আবার মুহাম্মদ নাম। তখনই সে ক্রোধে বেসামাল হইয়া পড়িল এবং লিপিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

দূত আবদুল্লাহ (রাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া নবী (সঃ)-কে তাঁহার লিপি ছিঁড়িয়া ফেলার সংবাদ পৌঁছাইতেই নবী (সঃ) আল্লাহর হুজুরে নিবেদন করিলে ان يمزقوا كل ممزق "আয় আল্লাহ! তাহারা যেন টুকরা টুকরা হইয়া যায় যেরূপ আমার লিপিকে টুকরা টুকরা করিয়াছে।" বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৫৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

ক্রোধে আত্মহারা সম্রাট ইতিমধ্যেই তাহার অধীনস্থ ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তা বাযানকে ফরমান পাঠাইল– অবিলম্বে আরবের নবুয়তের দাবীদার মুহাম্মদকে গ্রেফতার করিয়া আমার দরবারে হাযির কর। আদেশ পাওয়া মাত্র বাযান গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ দুই জন রাজ কর্মচারীকে মদীনায় পাঠাইয়া দিল। তাহারা মদীনায় পৌঁছিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং বাযানের গ্রেফতারী পরোয়ানার লিপি অর্পণ করিল।

রসূলুল্লাহ (সঃ) লিপির মর্মে মুচকি হাসি হাসিলেন এবং আগন্তুকদ্বয়কে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। নবীজী (সঃ) যখন কথা বলিতেছিলেন তখন তাহাদের বুক থর থর কাঁপিতেছিল। নবীজী (সঃ) তাহাদেরকে বলিলেন, আমার বক্তব্য আমি আগামীকল্য বলিব।

দ্বিতীয় দিন তাহারা নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও এবং তোমাদের প্রেরক বাযানকে সংবাদ দাও যে, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাহার প্রভু সম্রাটকে গত রাত্রির সাত ঘণ্টা অতিক্রান্তের পর মারিয়া ফেলিয়াছেন। সম্রাটের পুত্রকেই আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি লেলাইয়া দিয়াছেন। পুত্র তাহার পিতা সম্রাটকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা চলিত জুমাদাল উলা মাসের দশ তারিখ মঙ্গলবার রাত্রের ঘটনা। তাহারা উভয়ে ইয়ামনে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাযানকে ঐ সংবাদ পৌঁছাইলে বাযান এবং ইয়ামানে উপস্থিত তাঁহার পরিবারবর্গ ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–২৬৯)

৪। মিসরীয় কিবতী জাতির খৃস্টান শাসনকর্তা মোকাওকাসের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন হাতেব ইবনে আবু বালতায়া (রাঃ) মারফত। সে নবীজীর (সঃ) দূতকে সম্মান করিয়াছে, যথাসত্বর সাক্ষাত দান করিয়াছে, নবীজীর লিপিকে অতিশয় সম্মান করিয়াছে; একটি হস্তি দাঁতের কৌটায় হেফাযতের সহিত সংরক্ষণ করিয়াছে। নবীজীর (সঃ) জন্য মূল্যবান হাদিয়া–উপঢৌকনও পাঠাইয়াছিল; এই উপঢৌকনের মধ্যে ছিল কতিপয় দুষ্প্রাপ্য শ্বেত বর্ণের অশ্বতরী দুলদুল।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শনে মোকাওকাস কোন ত্রুটি করে নাই। সে শ্রদ্ধার সহিত নবীজীর লিপির উত্তরও দিয়াছে। উত্তরে সে প্রকাশ করিয়াছে– আমি জানিতাম, একজন নবীর আবির্ভাব বাকী রহিয়াছে; আমার ধারণা ছিল তাঁহার আবির্ভাব সিরিয়া হইতে হইবে।

মোকাওকাস ইসলাম গ্রহণ করে নাই। নবী (সঃ) নিজ উদারতা ও আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে তাহার উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অসন্তুষ্টির সহিত বলিয়াছিলেন, রাজত্বের লালসা তাহাকে ইসলাম হইতে বঞ্চিত রাখিল, অথচ তাহার রাজত্বের স্থায়িত্ব নাই। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–২৬০)

মোকাওকাস খৃস্টান ছিল, কিন্তু সে নবীজীর লিপিখানা সুরক্ষিতরূপে রাখিয়াছিল। দীর্ঘকাল তাহা

রাজভাণ্ডারে সযত্নে সুরক্ষিত ছিল। এমনকি এই যুগেও তাহা মুসলমানদে হস্তগত হইয়া কপির ফটো ব্লক প্রকাশিত হইয়াছে। বরকতের জন্য আমরা উহার ফটো ব্লক ছাপাইয়া দিলাম।

১৮৪০ ইং মোতাবেক ১২৬০ হিজরীর দিকে তুরস্কের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান আবদুল মজিদ খান। তখন মক্কা-মদীনাসহ হেজায এলাকা তুরস্কের শাসনেই ছিল। নবীজীর রওজা পাকের সবুজ গুম্বজসহ বর্তমান মসজিদে নববীর সম্মুখ ভাগ সুলতান আবদুল মজিদ খানের নির্মিত। সেই সুলতান আবদুল মজিদ খানের আমলের ঘটনা–

ফ্রান্সের একজন পর্যটক মিসরস্থ কিবতিয়া শহরে পৌঁছিলেন। তথায় খৃস্টানদের বড় একটি গির্জা ছিল; উক্ত গির্জার প্রধান যাজক পাদ্রীর নিকট ঐ লিপি মোবারক সুরক্ষিত ছিল। পর্যটক খোঁজ পাইয়া পাদ্রী হইতে তাহা ক্রয় করিয়া আনেন এবং সুলতান আবদুল মজিদ খান সমীপে উপহাররূপে উপস্থিত করেন।

তুরস্কের রাজভাণ্ডারে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কতিপয় বরকতপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন সুরক্ষিত আছে। সুলতান আবদুল মজিদ খান (রঃ) এই মহামূল্যবান লিপি মোবারকও তাহাতে শামিল করিয়া রাখেন। কোন মহামতি ব্যক্তির সৌজন্যে সেই মহামোবারক লিপির ফটো ব্লক প্রকাশিত হয়।

কালের আবর্তনে লিপির কোন কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে মনে হয় এবং লিপির গায়ে দাগ ও রেখা সৃষ্টি হইয়াছে। চেষ্টা করিলে উক্ত দাগ ও রেখামুক্ত ফটো ব্লক তৈয়ার করা সম্ভব হইত, কেহ কেহ সেইরূপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মূল বস্তুর অবিকল ছাপ গণ্য হয় না। তাই আমরা সেই চেষ্টায় অগ্রসর হই নাই।

ঢাকা লালবাগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুর্গে তথা কিল্লার ভিতরে শাহী আমলের যে মসজিদ আছে সেই মসজিদ হইতে এই মহাসওগাত লাভ করা হইয়াছে।

লিপির ছবিখানা নিম্নরূপ

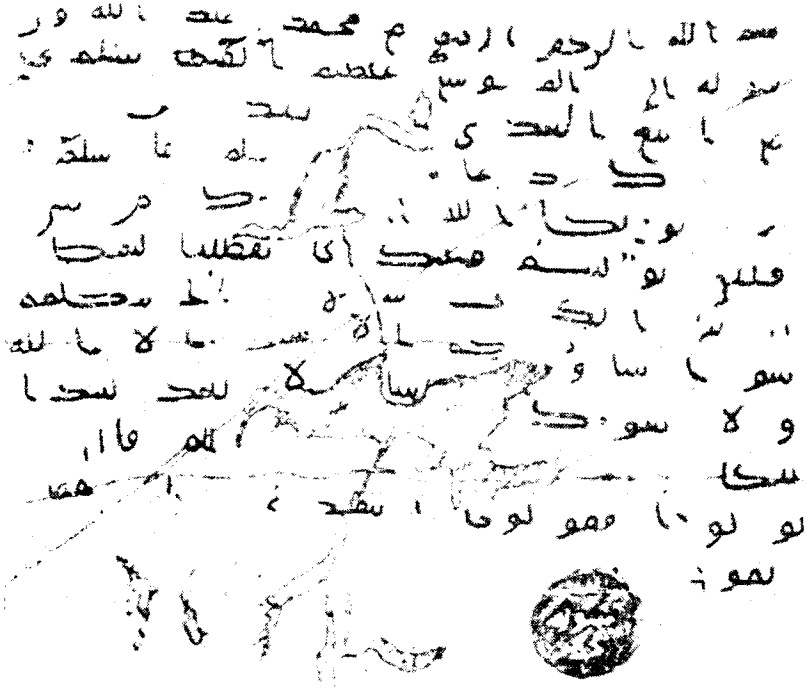

বর্তমান আরবিয় বর্ণমালায় লিপিখানার বিষ বস্তু এই –

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى الْمُقَوْقَسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ مَا يُفْجِعُ الْقِبْطَ ـ يٰاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানের রাহীম–

আল্লাহর বান্দা এবং তাঁহার রসূল মুহাম্মদের পক্ষ হইতে কিব্‌তী প্রধান মোকাওকাসের নিকট– সত্যের যে অনুসরণ করে তাহার প্রতি সালাম। অতপর আমি আপনাকে ইসলামের আহ্বান জানাইতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকিতে পারিবেন; আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। ইসলাম হইতে আপনি ফিরিয়া থাকিলে কিব্‌তী জাতির উপর যে বিপদ আসিবে সেই জন্য আপনি দায়ী হইবেন।

হে কিতাবধারীগণ! তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ঐকমত্যের কথাটি বাস্তবায়িত করার প্রতি আসিয়া যাও– তাহা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন কাহারও উপাসনা করিব না, তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করিব না এবং আমরা আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে প্রভুর মর্যাদা দিব না। যদি তোমরা একত্ববাদ বাস্তবায়িত করা হইতে ফিরিয়া থাক তবে সাক্ষী থাকিও– আমরা এক আল্লাহর সমীপে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী।

৫। রোমের আশ্রিত রাজ্য সিরিয়ার শাসনকর্তা মোনযের ইবনে হারেসগাস সানীর নিকটও নবী (সঃ) লিপি শুজা ইবনে ওহ্‌ব (রাঃ) ছাহাবী মারফত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বেদায়াহ, ৩–৬৮) প্রথম খণ্ড ৬ নং হাদীছে বর্ণিত ঘটনায় রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সিরিয়াস্থ ইলিয়া শহরে আগমনের যে উল্লেখ রহিয়াছে– সেই আগমন উপলক্ষে রোম সম্রাটের আতিথেয়তার ব্যবস্থাপনায় তখন মোনযের ইবনে হারেস অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত ছিল।

লিপিবাহক শুজা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শাসনকর্তা হারেসের সাক্ষাতের জন্য পৌঁছিলাম এবং ২/৩ দিন অপেক্ষারত থাকিলাম। তাহার এক গৃহরক্ষী ছিল রোমান বংশীয়, তাহার নাম "মোরী"। সে আমাকে বলিল, অমুক অমুক বিশেষ দিন ছাড়া হারেসের সাক্ষাত হইবে না। আমি অপেক্ষায় থাকিলাম। মোরীর সহিত আমার বেশ সম্পর্ক হইয়া গেল। সে আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করিত। উত্তরে আমি নবীজীর (সঃ) গুণাবলী বর্ণনা করিতাম এবং তিনি যেই ধর্মের আহ্বান করিয়া থাকিতেন সেই ধর্ম ইসলামের বয়ানও তাহার নিকট করিতাম। মোরী আমার বক্তব্য শ্রবণে অত্যধিক মোহিত হইত, এমনকি কাঁদিয়া অস্থির হইয়া যাইত আর আমাকে বলিত, "আমি ইঞ্জীল কিতাব পাঠ করিয়া থাকি! তাহাতে এই নবীর গুণাবলীর উল্লেখ ঠিক এইরূপই পাইয়া থাকি। আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। অবশ্য আমি ভয় করি, মোনযের ইবনে হারেস জানিতে পারিলে আমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবে।" মোরী আমাকে অত্যধিক সম্মান করিত এবং যত্নের সহিত আতিথেয়তা করিত।

একদা শাসনকর্তা হারেস রাজমুকুট পরিধানে দরবারে বসিল এবং আমাকে সাক্ষাত দানের সময় দিল। আমি উপস্থিত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লিপিখানা তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম। লিপির বিষয়বস্তু ছিল এই–

سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَاٰمَنَ بِهٖ وَاَدْعُوْكَ اِلٰى اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ يَبْقٰى مُلْكُكَ .

অর্থ ঃ "সালাম তাহার প্রতি যে সত্যের অনুসরণ করে এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আমি আপনাকে আহ্বান জানাই, আপনি আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করুন যিনি এক– তাঁহার কোন শরীক নাই; আপনার রাজত্ব অটুট থাকিবে।" (বেদায়া, ৩–২৬৮)

সে লিপি পাঠ করিয়া ক্রোধে বেসামাল হইয়া পড়িল এবং লিপিখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল, এমন কে আছে যে আমার রাজত্ব ছিনাইয়া নিতে পারে? আমি অভিযান চালাইব এবং সে সুদূর ইয়ামানে থাকিলেও তাহাকে পাকড়াও করিয়া আনিব। এখন হইতে লোক-লস্কর একত্রিত করা হইবে। ঐ দরবারে বসা অবস্থায়ই সে সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিল এবং তথা হইতে উঠিয়া যুদ্ধের অশ্বসমূহের পায়ে নাল লাগাইয়া প্রস্তুত করার আদেশ জারি করিয়া দিল।

লিপিবাহক শুজা (রাঃ) বলেন, সে যুদ্ধের এইসব তৎপরতা ও প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া আমাকে বলিল, তোমার গুরুকে এই সমাচার অবগত কর। শাসনকর্তা মোনযের ইবনে হারেস রোম সম্রাটের নিকটও পত্রযোগে আমার বিষয় এবং যুদ্ধের জন্য তাহার প্রস্তুতির সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

রোম সম্রাটের অবস্থা ত ৬নং হাদীছে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে, সে নবীজীর (সঃ) বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্বদানে ভাবাবেগে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব রোম সম্রাট তাহাকে পত্রের উত্তরে সতর্ক করিয়া দিল যে, ঐ নবীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবে না; তাঁহার বিরুদ্ধে তৎপরতা বন্ধ কর, আর ইলিয়া শহরে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাত কর।

শুজা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, শাসনকর্তা মোনযের ইবনে হারেসের নিকট যখন রোম সম্রাটের এই উত্তর পৌঁছিল তখন সে দমিয়া গেল। সে আমাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমার গুরুর নিকট প্রত্যাবর্তনে কোন্ দিন যাত্রা করিবেন? আমি বলিলাম, আগামীকল্য। মোনযের তৎক্ষণাত আমাকে একশত তোলা স্বর্ণ এবং যাতায়াত ব্যয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার দেওয়ার আদেশ করিল। আর মোরীকে আদেশ করিল, আমার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্য।

মোরী আমার মারফত নবীজী (সঃ)-এর সমীপে সালাম আরজ করিলেন। আমি নবীজীর খেদমতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোনযের ইবনে হারেসের সমুদয় সংবাদ অবগত করিলাম। নবী (সঃ) বলিলেন, তাহার রাজত্বের অবসান অবশ্যম্ভাবী। আর নবী সমীপে মোরীর পক্ষ হইতে সালাম নিবেদন করিলাম এবং তাঁহার কথাবার্তা শুনাইলাম। নবী (সঃ) বলিলেন, সে সত্যবাদী। মোনযেরের ভাগ্যে ঈমান জুটিল না।

(তাবাকাত, ১–২৬২)

৬। আরবের একটি প্রসিদ্ধ সুফলা এলাকা "ইয়ামামা"। তথাকার সর্বপ্রধান ব্যক্তি ছিল "হাওয়াযা ইবনে আলী।" এলাকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ ব্যক্তি তথাকার সর্বাধিক প্রভাবশালী লোক। তাহার নিকটও নবী (সঃ) সালীত ইবনে আম্র (রাঃ) ছাহাবী মারফত লিপি পাঠাইলেন। লিপিতে তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান না করিলেও মোলায়েমভাবে প্রত্যাখ্যানই করিল। সে নবীজীর (সঃ) লিপির উত্তরে লিপি লিখিল, যাহার মর্ম এই ছিল– আপনি যেই বস্তুর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন তাহা অতি সুন্দর ও উত্তমই বটে। তবে আমি আমার জাতির কবি ও বক্তা, সমগ্র আরব আমাকে ভয় করে। অতএব প্রাধান্যের কিছু অংশ আপনার সহিত আমাকে দিতে হইবে, তবেই আমি আপনার কথা গ্রহণ করিতে পারি।

সে লিপির এই উত্তর দান করিল আর নবীজী (সঃ)-এর দূতকে পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিভিন্ন উপঢৌকন

প্রদান করিল। দূত প্রত্যাবর্তন করিলে নবীজী (সঃ) তাহার লিপি পাঠ করিয়া বলিলেন, (ইসলামের বিনিময়ে) যদি সে একটি খেজুর পরিমাণ জায়গার কর্তৃত্বও দাবী করে তাহাও দান করিতে আমি প্রস্তুত নহি। তাহার ধন-সম্পদ অচিরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

পাঠক! নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কর্মতৎপরতার দ্রুত গতির নমুনা এখানেই দেখা যায়। প্রায় ১৫০০ ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ৩০০ মাইল সফর করতঃ ওমরা করার নিয়তে মক্কার নিকটে পৌঁছিলেন। মক্কাবাসীরা মক্কায় যাইতে দিল না; বিরাট ঝামেলার পরে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আবার সেই প্রায় ৩০০ মাইল ভ্রমণ করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অত বড় সফর এবং ঝামেলা অতিক্রম করতঃ মদীনায় পৌঁছিয়া এক মাসেরও অনেক কম সময় মদীনায় অবস্থান করিলেন। তাহার পরেই আরবে ইহুদী শক্তির সর্বপ্রধান কেন্দ্র খায়বর অভিযানে তাঁহাকে যাইতে হইল– যাহা এক ভয়াবহ অভিযান ছিল।

মধ্যবর্তী এই সামান্য সময়েও নবী (সঃ) তাঁহার দায়িত্ব পালনের তৎপরতায় বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নিলেন না। এই ১০/২০ দিনের মধ্যেই নবী (সঃ) বহির্বিশ্বে ইসলামকে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়াইয়া দেওয়ার বিপ্লবী ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন। একই দিনে উল্লিখিত ছয় জন দূতকে ছয়টি দেশে প্রেরণ করিয়া এক সঙ্গে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামকে ছড়াইয়া দিলেন। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মহাআহ্বানে তিনটি মহাদেশেই এক অপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হইল– সম্রাটের রাজসিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল, বিশ্ব শক্তিসমূহও আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

মরু নিবাসী ও খেজুর পাতার মসজিদে দরবার অনুষ্ঠানকারী নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লিপিগুলির রাজকীয় মহত্ত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা, গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা, আত্মাভিমানপূর্ণ বাক্যাবলী, শক্তি সামর্থ্যের কণ্ঠধারী শব্দাবলী পৃথিবীর খ্যাতনামা সম্রাট এবং গর্ব-অহঙ্কারে পরিপূর্ণ বীরগণকে কাঁপাইয়া তুলিল। শত শত যুগে যাহা সম্ভব হইত না শুধু লিপির দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উল্লিখিত ছয়খানা লিপি ছাড়া আরও অনেক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা–

৭। আয্দ বংশীয় শাসনকর্তা জায়ফর এবং তাঁহার ভ্রাতা আব্দ– তাঁহাদের প্রতি নবী (সঃ) আম্র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) ছাহাবীকে লিপি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৮। বাহ্রাইনের শাসনকর্তা মোনযের ইবনে সাওয়ার নিকটও নবী (সঃ) আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ) ছাহাবী মারফত লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণপূর্বক নবীজীর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আমার দেশে ইহুদী ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায় বাস করে: তাহাদের প্রতি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিব। নবী (সঃ) উত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, আপনি যাবত সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, আপনার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকিবে। আর ইহুদী ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায় অনুগত নাগরিকরূপে রাষ্ট্রীয় কর আদায় করিলে তাহারা নিজ নিজ ধর্মে থাকিয়া দেশে বসবাস করিবার সুযোগ-সুবিধা পূর্ণরূপে ভোগ করিবে।

৯। গাসসানের শাসনকর্তা জাবালা ইবনে আইহামকেও নবী (সঃ) লিপি লিখিয়াছিলেন। সে তখন মুসলমান হইয়াছিল। খলীফা ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রোধে ইসলাম ত্যাগ করত পলাইয়া গিয়াছিল।

১০। সামাওয়াহ্ এলাকার শাসক নুফাসা ইবনে ফরওয়াহ্কেও রসূল (সঃ) লিপি লিখিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিও নবী (সঃ) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা–

১১। ইয়ামানের হারেসা, ১২। শোরায়হ, ১৩। নোয়াএম, তাঁহারা তিন ভ্রাতা আবদে কুলালের পুত্র প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। নবী (সঃ) প্রত্যেকের নিকটই ভিন্ন ভিন্ন লিপি পাঠাইয়াছিলেন। তদ্রূপ ইয়ামানে ১৪। নোমান, ১৫। মাআফের, ১৬। হামদান, ১৭। যোরআ– তাঁহাদেরকেও ভিন্ন ভিন্ন লিপি

লিখিয়াছিলেন। তাহাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন ইয়ামনের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি– ১৮। জীলকুলা এবং ১৯। জী আম্‌রকেও লিপি লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকি পবিত্র কোরআনে সূরা ফীলের ইতিহাসের নায়ক আব্‌রাহা রাজার কন্যা "জোরায়বা" জীল কুলার স্ত্রী ছিলেন, তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ২০। আব্‌রাহার পুত্র মা'দীকারেবকেও লিপি লিখিয়াছিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১। নবী (সঃ) নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মোসায়লামা কাজ্জাবের নিকটও ইসলামের প্রতি আহ্বানে লিপি পাঠাইয়াছিলেন।

২২। রোমানদের প্রসিদ্ধ পাদ্রী জাগাতেরকেও লিপি লিখিয়ছিলেন।

নবী (সঃ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধানদেরকেও লিপি লিখিয়াছিলেন। যথা–

২৪। ইয়ামানস্থিত নাজরানের সুপ্রসিদ্ধ গির্জার পাদ্রীদের নিকট নবী (সঃ) লিপি পাঠাইয়াছিলেন।

২৫। আরব সাগরের উপকূলীয় হাজরামউত এলাকার কতিপয় সর্দার প্রধানের নিকটও লিপি লিখিয়াছিলেন।

লিপির মাধ্যমে বিশ্বের কোণে কোণে ইসলামের ডাক পৌঁছাইয়া দেওয়া– ইহাও নবীজীর নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপায় ছিল, যাহার আশাতীত সুফল লাভ হইয়াছিল।

এই বৎসরের প্রথম মাস মহররমেই ইহুদী শক্তি নিস্তব্ধকারী খয়বর জেহাদ অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে প্রায় দশ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৎসরই নবী (সঃ) চৌদ্দ শতের অধিক ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ওমরা করার জন্য বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ওমরা আদায় করিয়াছিলেন। হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে নবী (সঃ) ঐসব ছাহাবীগণকে লইয়া ওমরা করার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা বাধা দেওয়ায় ওমরা আদায় করিতে পারেন নাই। অবশ্য পরস্পর সন্ধি হইয়াছিল– যাহা "হোদায়বিয়ার সন্ধি" নামে প্রসিদ্ধ। সেই সন্ধির শর্ত অনুসারে এই বৎসর বিনা বাধায় মুসলমানগণ ওমরা আদায় করিয়াছিলেন।

হিজরী অষ্টম বৎসর

ইসলাম ও মুসলমানদের মহা বিজয়ের বৎসর

এই বৎসরের প্রথম জেহাদ মুতার জেহাদ। এই জেহাদে নবীজী (সঃ) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন না। অত্যন্ত ভয়াবহ জেহাদ ছিল ইহা। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্ধারিত একের পর এক তিন জন আমীর বা কমাণ্ডার– নবীজীর পালক পুত্র যায়েদ (রাঃ), চাচাত ভাই জাফর (রাঃ) এবং বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) প্রত্যেকেই শহীদ হইয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

এই বৎসরই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তথা ইসলাম ও মুসলিম জাতির মহাবিজয়, চরম বিজয়, সুস্পষ্ট বিজয়– ফত্‌হে মুবীন তথা মক্কা বিজয় লাভ হয়। অধিকন্তু মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ– হোনায়ন, আওতাস, তায়েফ ইত্যাদিও জয় করা হয়; সর্বত্রই ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে।

নবীজী (সঃ)-এর উদারতা

আরবের বিখ্যাত কবি যোহায়র, তাহার পরিবারের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট কবি। তাহার দুই পুত্র– বোজায়র এবং কা'বও প্রসিদ্ধ কবি। মক্কা বিজয়ের পর বোজায়র ইসলাম গ্রহণপূর্বক নবীজীর সহিত মদীনায় চলিয়া আসিলেন। মদীনা হইতে ভ্রাতা কা'বকে পত্র লিখিয়া নিজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন এবং

তাহাকেও লিখিলেন, যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া আসিলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহার ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পূর্বেকার অপরাধ ক্ষমা করেন। অতএব তোমার অন্তরে যদি ইসলামের প্রতি আকর্ষণ হয় তবে যথাসত্বর চলিয়া আস, অন্যথায় প্রাণ বাঁচাইবার আশ্রয়স্থলের খোঁজ কর।

কা'ব উত্তরে কাব্যের মাধ্যমে নবীজী (সঃ)-কে কটাক্ষ করিয়া পত্র লিখিল। তাহার পত্রের কটাক্ষে নবীজী (সঃ) তাহার উপর রুষ্ট হইলেন এবং লোকেরা তাহাকে ভয় দেখাইল যে, তুমি প্রাণ হারাইবে। অবশেষে কা'বের মতি পরিবর্তিত হইল– সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদারতার প্রশংসা করিয়া একটি কবিতা রচনা করিল। অতপর গোপনে মদীনায় আসিয়া এক পরিচিত ছাহাবীর আশ্রয় নিল। ঐ ছাহাবী তাহাকে লইয়া নবীজী (সঃ)-এর মসজিদে ফজরের নামায পড়িলেন। ঐ ছাহাবী নামাযের পরে কা'বকে নবীজীর (সঃ) প্রতি ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিলেন। নবী (সঃ) কা'বকে চিনেন না। এই সুযোগে কা'ব নিজেই নবী (সঃ)-কে বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! যোহায়র পুত্র কা'ব অনুতপ্ত হইয়া ইসলাম গ্রহণপূর্বক আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছে। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন– যদি আমি তাহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হাঁ– নিশ্চয়! তৎক্ষণাত কা'ব বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি নিজেই কা'ব। এই বলিয়া কবি কা'ব (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশে রচিত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতা "বানাত সোআ'দ" ঐ মজলিসেই পাঠ করিয়া শুনাইলেন। উক্ত কবিতায় তিনি উল্লেখ করিলেন–

আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে ভয় দেখানো হইয়াছে, কিন্তু আল্লাহর রসূলের দরবারে ক্ষমার আশা অতি উজ্জ্বল। আমার প্রতি সহিষ্ণু হউন; আল্লাহ আপনাকে মহান কোরআনে কত কত সুন্দর উপদেশমালা দান করিয়াছেন! মিথ্যা দোষ চর্চাকারীদের কথায় আমাকে মেহেরবানীপূর্বক অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন না। লোকেরা আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমি অপরাধী নহি।

নবীজী (সঃ) -এর প্রশংসায় তিনি একটি উক্তি অতি চমৎকার করিয়াছেন–

"রসূল আল্লাহর নূর, বিশ্ব হয় তাহাতে উজালা।
আল্লাহর উন্মুক্ত তলোয়ার তিনি, হিন্দী উহার শলা।"

নবী (সঃ) সন্তুষ্ট হইয়া কবিকে তাঁহার গায়ের চাদর মোবারক পুরস্কারস্বরূপ দান করিলেন। চাদরখানা কা'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট আজীবন ছিল। খলীফা মোআবিয়া (রাঃ) কবির নিকট হইতে দশ হাজার দেরহামে– রৌপ্য মুদ্রায় উহা ক্রয় করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু কবি কা'ব (রাঃ) সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বরকতপূর্ণ বস্ত্র আমি কোন মূল্যে কাহাকেও দিব না। কবির ইন্তেকালের পর মোআবিয়া (রাঃ) বিশ হাজার দেরহামে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিয়াছিলেন। অতপর তাহা বনু উমাইয়া বংশীয় বাহশাহগণের নিকটই পরম্পর পবিত্র বস্ত্ররূপে সমাদর লাভ করিতে থাকে। তাঁহাদের রাজধানী বাগদাদের উপর যখন দস্যু তাতারীদিগের আক্রমণ হয় তখন সেই চাদর মোবারক নিখোঁজ হইয়া যায়। (যোরকানী, ৩– ৬০)

হিজরী নবম বৎসর

এই বৎসরের সেরা ঘটনা ছিল তবুকের জেহাদ। ইহাই ছিল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সক্রিয় সর্বশেষ জেহাদ। ইসলামের দশ বৎসর সামরিক জীবনে এই জেহাদের ন্যায় এত অধিক সৈন্য সমাবেশ আর কোন জেহাদে হয় নাই। এ যাবতকালের জেহাদসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ সৈন্য সংখ্যা বার হাজার ছিল হোনায়ন জেহাদে। মক্কা বিজয়েও দশ হাজার ছিল, কিন্তু তবুক জেহাদে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নীতি ছিল, অধিক জনসমাবেশ দেখিলে তিনি তাঁহার আদর্শ ও উপদেশ ব্যক্ত করায় তৎপর হইতেন এবং সুদীর্ঘ ভাষণ দিতেন। সেমতে তবুক এলাকায় পৌঁছিয়া শিবির স্থাপনের পরই নবীজী (সঃ) এই বিশাল জনসমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া নৈতিকতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করিলেন। সেই ভাষণের উপদেশমালা চির স্মরণীয়। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভাষণ ছিল–

حمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال ايها الناس اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة ابراهيم وخير السنن سنة محمد (صلى الله عليه وسلم) واشرف الحديث ذكر الله واحسن القصص هذا القران وخير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدى هدى الانبياء واشرف الموت قتل الشهداء واعمى العمى الضللة بعد الهدى وخير الاعمال ما نفع وخير الهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب ـ

واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر والهى وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيمة ومن الناس من لا ياتى الجمعة الا دبرا ومن الناس من لايذكر الله الا هجرا ومن اعظم الخطايا اللسان الكذوب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى ورآس الحكمة مخافة الله عزوجل وخير ما وقر فى القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من جثاء جهنم والشعر من مز امير ابليس والخمر جماع الاثم والنساء جبائل الشيطان ـ والشباب شعبة من الجنون وشر المكاسب كسب الربو وشر الماكل اكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقى من شقى فى بطن امه وانما يصير احدكم الى موضع اربعة اذرع والامر الى الاخرة وملاك العمل خواتمه وشر الروايا روايا الكذب وكل ما هو ات قريب وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر واكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة ومن يستغفره يغفر له ومن يعف يعفه الله ومن يكظم ياجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يبتغى السمعة يسمع الله به ومن يصبر يضعف الله له ومن يعص الله يعذبه الله اللهم اغفرلى ولامتى اللهم اغفرلى ولامتى اللهم اغفرلى ولامتى استغفر الله لى ولكم

প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগান করিলেন, তারপর বলিলেন– হে জনমণ্ডলী! আল্লাহর গুণগানের পর– স্মরণ রাখিও, সর্বাধিক সত্য বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বাধিক মজবুত ও শক্তিধারী মুক্তির কালেমা– কালেমা তওহীদ। ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ে সর্বোত্তম (হযরত) ইব্রাহীমের ধর্মের মূলসমূহ, সর্বোত্তম

আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। সর্বোচ্চ বাক্য আল্লাহর যিকির এবং সর্বাধিক সুন্দর ইতিহাস কোরআনের ইতিহাস।* শরীয়তের নির্দেশাবলীই সর্বোত্তম কাজ এবং গর্হিত কার্যাবলী সর্বাধিক মন্দ। সর্বাধিক সুন্দর জীবনব্যবস্থা নবীগণ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা। সর্বাধিক সম্মানের মৃত্যু শহীদগণের আত্মদান। হেদায়েতের সুযোগ পাইয়াও ভ্রষ্টতার উপর থাকা সর্বাধিক বড় অন্ধতা। উৎকৃষ্ট আমল তাহা যাহার উপকার ভোগ করা যায়। উত্তম জীবন ব্যবস্থা উহা যাহার ব্যবস্থাপক নিজে অনুসরণ করিয়াছে। জ্ঞান বিবেকের অন্ধতা সর্বাধিক ঘৃণিত অন্ধতা।

দানকারী হস্ত গ্রহণকারী হস্ত অপেক্ষা উত্তম। প্রয়োজন পরিমাণ কম ধন-সম্পদ উত্তম সেই বেশী পরিমাণ হইতে যাহা উদাসীন বানাইয়া দেয়। মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়া ওজর আপত্তি করা ঘৃণ্য কাজ, কেয়ামত দিবসে লজ্জিত হইতে হইলে তদপেক্ষা অপমান আর কিছুই নাই। অনেক মানুষ জুমার নামাযে উপস্থিত হইতেও বিলম্ব করে, অনেকে আল্লাহর যিকির পূর্ণ মর্যাদার সহিত করে না (তাহা ভাল নহে)। জবানকে মিথ্যার অভ্যস্ত বানানো অতি বড় গোনাহ। অন্তরের তৃপ্তিই বড় ধনাঢ্যতা। মানুষের উত্তম সম্বল পরহেজগারী। বড় জ্ঞান-বিজ্ঞান হইল মহান আল্লাহর ভয়। অন্তরে বদ্ধমূল বিষয়ের উত্তমটি হইল আল্লাহর প্রতি আস্থা বিশ্বাস; তাহাতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ কুফরী গোনাহ। শোক বিলাপ অন্ধকার যুগের রীতি। অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ (দ্বারা প্রতিপালিত দেহ) জাহান্নামের জ্বালানি হইবে। সাধারণ কাব্য শয়তানের সুর। মদ নানাবিধ গোনাহ একত্রকারী। নারী শয়তানের ফাঁদ। (নারীর মাধ্যমে শয়তান মানুষকে আল্লাহর বহু নাফরমানীতে লিপ্ত করিতে প্রয়াস পায়)। যৌবন উন্মাদনারই অংশবিশেষ। ঘৃণ্য উপার্জন সুদের উপার্জন। জঘন্য খাদ্য এতিমের মাল খাওয়া। অন্যকে দেখিয়া যে শিক্ষা লাভ করে সেই সৌভাগ্যশালী। হতভাগা শুধু সে যে মায়ের উদর হইতেই হতভাগা হইয়া জন্ম নিয়াছে।* প্রত্যেকেই পাইবে দুনিয়ার শেষ সীমা চারি হাত জায়গা (তথা

কবরের স্থানটুকু, সেই অনুপাতেই দুনিয়ার জন্য ব্যস্ততা অবলম্বন করিবে)। ভাল-মন্দের শেষ ফয়সালা চিরস্থায়ী আখেরাতে হইবে। সারা জীবনের আমলকে সংরক্ষণ করে শেষ জীবনের আমল। মিথ্যা বর্ণনার উদ্ধৃতকারীও জঘন্য। প্রত্যেক আগত সময় নিকটতম (অতএব পরকাল নিকটতমই বটে)। মোমেনকে গালি দেওয়া ফাসেকী গোনাহ, মোমেনের সঙ্গে লড়াই করা কুফরী গোনাহ, অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা করা আল্লাহর নাফরমানী, তাহার ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা তাহার জানের নিরাপত্তার সমান। যেব্যক্তি আল্লাহর কার্যের উপর কসম খাইবে, আল্লাহ তাহাকে মিথ্যুক বানাইবে।* যে কেহ আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন। যেব্যক্তি পাকপবিত্র থাকার সাধনা করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাক পবিত্র থাকায় সাহায্য করিবেন। যেব্যক্তি ক্রোধ দমাইয়া রাখিবে আল্লাহ তাহাকে সওয়াব দান করিবেন। ক্ষয়-ক্ষতি বিপদে যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষতিপূরণ দান করিবেন। যেব্যক্তি লোকদের নিকট সুখ্যাতি অর্জন করা ভালবাসে আল্লাহ তাআলা (কেয়ামত দিবসে)* সর্বসমক্ষে তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া দণ্ড দিবেন। যে ব্যক্তি আপদে-বিপদে সর্বক্ষেত্রে ধৈর্যধারণকারী হইবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে অনেক গুণ বেশী সওয়াব দিনেব। নাফরমানী যে করিবে আল্লাহ তাহাকে দণ্ড দিবেন।

হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, আয় আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, আয় আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন (তিন বার বলিলেন)। আল্লাহর

* পবিত্র কোরআনে পূর্ববর্তী বহু জাতি, বহু শক্তি এবং বহু দুর্ধর্ষ ব্যক্তির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উপদেশ গ্রহণে ঐসব ইতিহাসের তুলনা নাই।

* অর্থাৎ মায়ের পেট হইতে হতভাগা হইয়া জন্ম নেওয়ার তথ্য ত কাহারও জানা নাই; সুতরাং কেহ নিজেকে ভাগ্য বঞ্চিত, ভাগ্য বিতাড়িত, হতভাগা গণ্য করিয়া কার্য ময়দানে নিক্রীয় বসিয়া থাকিবে না। শত বার অকৃতকার্য হইলেও শত বারই কৃতকার্যতার জন্য চেষ্টা করিবে।

* যেমন কেহ অন্য একজন মুসলমানকে নির্দিষ্ট করিয়া বলিল, কসম খোদার তোর গোনাহ মাফ হইবে না। এইরূপ অনধিকার কথা আল্লাহ না পছন্দ করেন।

নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য। (বেদায়া, ৪-১২)

মসজিদে যেরার

"যেরার" শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র। মদীনায় এক খৃস্টান পাদ্রী ছিল আবু আমের। নবীজী (সঃ) তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন, কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ না করিয়া ইসলামকে মদীনা হইতে চির বিদায় দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বদর জেহাদের পরে মক্কায় যাইয়া মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা সৃষ্টি করিল, যাহার পরিণামে ওহুদের যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে তাহার মনের আশা পুরিল না; তাহার ষড়যন্ত্র চলিতেই থাকিল, এমনকি সে রোম সম্রাটের সহিত যোগাযোগ করিল মদীনা আক্রমণের জন্য। রোম সম্রাটও খৃস্টান, তাই তাহার সহিত যোগাযোগ খুব গাঢ়ভাবেই হইল। আবু আমের ঘন ঘন রোম যাইত এবং মদীনায় আসিয়া মদীনার মোনাফেকদের সহিত সলা-পরামর্শ করিত। আবু আমেরের তৎপরতা চালাইতে সুবিধা লাভের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থানের (অফিস গৃহের) প্রয়োজন। এই উদ্দেশে কোবা পল্লীতে নবীজীর (সঃ) তৈয়ারী সর্বপ্রথম মসজিদের নিকটবর্তীই মোনাফেকরা আর একটা মসজিদের আকৃতি তৈয়ার করিল। উহাতে তাহাদের এই উদ্দেশ্য ও থাকিল যে, কোবা মসজিদ হইতে কিছু মুসল্লী খসাইয়া এই মসজিদে আনিতে পারিলে ধীরে ধীরে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে দুইটা সমাজ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা সহজ হইবে। এইসব ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশে এই মসজিদ আকৃতির ঘরটা তৈয়ার করিল। মুসলমানদের নিকট উহাকে পুরাপুরি মসজিদ সাব্যস্ত করিবার জন্য নবীজীর দ্বারা এই মসজিদে নামায আরম্ভের পরিকল্পনা করিল। সেমতে মোনাফেক দল নবীজীর নিকট আসিয়া মিনতির সহিত আবেদন জানাইল যে, রুগ্ন ও দুর্বলদের জন্য সব সময় দূরের মসজিদে যাওয়া কষ্টকর হয়। তাই কোবা পল্লীতে আমরা দ্বিতীয় আর একটি মসজিদ তৈয়ার করিয়াছি; আমাদের আরজু, আপনি ঐ মসজিদে নামায আরম্ভ করিয়া দিবেন।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) তখন তবুক জেহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত, তাই তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তবুক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি তথায় নামায পড়াইয়া দিব। তবুক হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে নবী (সঃ) "আওয়ান" নামক স্থানে পৌছিলেন। তাহা মদীনার অতি নিকটবর্তী, তথা হইতে মদীনা মাত্র এক ঘণ্টার পথ। ঐ সময় উক্ত মসজিদ নামীয় মোনাফেকী ষড়যন্ত্রের আড্ডা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইয়া গেল এবং তথায় যাইতে নবীজী (সঃ)-কে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ۔ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى ۔ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۔ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۔

অর্থ ঃ "যাহারা মসজিদ তৈয়ার করিয়াছে ইসলামের অনিষ্ট সাধন উদ্দেশে, কুফরী কাজের উদ্দেশে, মোমেনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং পূর্ব হইতে আল্লাহ ও রসূলের সহিত শত্রুতা বাধাইয়াছে- এমন এক ব্যক্তির কর্মস্থল বানাইবার উদ্দেশে অথচ আপনার নিকট আসিয়া মিথ্যা কসম খাইয়া তাহারা বলে, আমরা ভাল উদ্দেশে এই মসজিদ তৈয়ার করিয়াছি। আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। আপনি কস্মিনকালেও তাহাদের সেই মসজিদে দাঁড়াইবেন না। (পারা- ১১, রুকু-২)

আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর সঙ্গে সঙ্গে "আওয়ান" এলাকা হইতে নবী (সঃ) দুই জন ছাহাবীকে সরাসরি এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, এখনই যাইয়া উক্ত মসজিদে আগুন লাগাইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। ছাহাবীদ্বয় তাহাই করিলেন। মোনাফেকদের দল তথা হইতে ছুটাছুটি করিয়া পলাইয়া গেল। (বেদায়া, ৪-২১)

চতুর্দিক হইতে ইসলামের জয়জয়কার

ষষ্ঠ বৎসরের শেষ দিকে হোদায়বিয়ার সন্ধি হইয়াছিল। ঐ সন্ধির শর্তগুলি সাধারণ দৃষ্টিতে খুবই হেয়তাজনক ছিল, কিন্তু শান্তির অগ্রদূত, শান্তির মহাসাধক, মানুষের প্রেম-ভালবাসার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাগুরু নবীজী মোস্তফা (সঃ) ঐরূপ একটি সন্ধির প্রতি ব্যাকুল ছিলেন। কারণ, যুদ্ধ দ্বারা নহে বরং সত্যের আহ্বান দ্বারা বিশ্ব জয় করাতেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার নবী জীবনের সাফল্য মনে করিতেছিলেন। কোরায়েশদর যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিড়ে নবীজী (সঃ) সেই অবকাশ পাইতেছিলেন না। ইসলাম শান্তির সাধনা– শান্তিতেই এই সাধনার প্রকৃত স্বরূপ লোক সমক্ষে উদ্ভাসিত হইতে পারে। সেই শান্তির সুযোগই নবীজী মোস্তফা (সঃ) খুঁজিতেছিলেন। তাই তিনি কোরায়শদের সমস্ত অন্যায় জেদ স্বীকার করিয়া লইয়াও সন্ধিকে চূড়ান্তে পৌঁছাইয়াছিলেন এবং সেই সন্ধিকে নবীজী (সঃ) মহা বিজয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সন্ধি যে ইসলামের মহাবিজয় ছিল তাহার বিকাশ ধাপে ধাপে হইয়াছে। সন্ধির দ্বারা শান্তির অবকাশ পাইতে এক দিনেরও বিশ্রাম না লইয়া নবীজী (সঃ) সপ্তম বৎসরের আরম্ভ হইতেই চতুর্দিকে লিপি প্রেরণ করিয়া ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সর্বত্র ইসলামের ডাক পৌঁছাইয়া দিলেন। রাজদরবারে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে এবং গোত্রে গোত্রে ইসলামের আহ্বান পৌঁছিয়া গেল। এই অভিযানে বিরাট সাফল্য লাভ হইল। আবিসিনিয়ার সম্রাট, বাহরাইনের শাসনকর্তা, ওমানের শাসনকর্তা, গাস্‌সানের শাসনকর্তা এবং অনেক গোত্রপতিসহ বিভিন্ন শক্তি শিবিরে ইসলাম প্রবেশ করিল, বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করিলেন। উক্ত অভিযানে ইসলামের ডাক সর্বত্রই আলোড়নের সৃষ্টি করিল এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এক বিরাট অংশ ইসলামের আহ্বান পাইয়াও আর এক বিষয়ের অপেক্ষায় থাকিয়া গেল।

মুহাম্মদ (সঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণকারী এবং কোরায়শ বংশের লোক। মুসলমানদের খোদার ঘর মক্কায়। মুহাম্মদ (সঃ) এখনও মক্কা জয় করিতে পারেন নাই, কোরায়শরা এখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই, খোদার ঘর কা'বা এখনও ঠাকুর-দেবতা, মূর্তি-প্রতিমায় পরিপূর্ণ। সুতরাং কোরায়েশ ও মুসলমানদের চূড়ান্ত সংঘর্ষ অনিবার্য– সেই সংঘর্ষের ভবিষ্যত পরিণামের অপেক্ষায় বহু এলাকা, বহু গোত্র, বহু শক্তি ইসলাম হইতে দূরে থাকিয়া দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা মনে করিতেছিল, এই চূড়ান্ত সংঘর্ষেই সত্য-মিথ্যার সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হইবে; সত্য বিজয়ী এবং মিথ্যা পরাভূত হইবে। একদিকে কোরায়শদের পূজিত শত শত দেব-দেবী– যাহাদের তাহারা বিজয়ের উৎস মনে করে, অপর দিকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলিতেছেন, এই ঠাকুর দেবতা এবং দেব-দেবী মূর্তিগুলি অক্ষম জড় পদার্থ, পক্ষান্তরে তাঁহার আল্লাহই এক ভাবে সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা। এই দুই মতবাদে নিশ্চয় লড়াই হইতে থাকিবে। যদি মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দল কোরায়শদের দ্বারা পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তবে আমরা লড়াই-বিগ্রহ ছাড়াই তাহাদের হইতে নিস্তার পাইয়া যাইব। আর যদি দেব-দেবীদের পূজারী ও পুরোহিত এবং জাতি হিসাবে দুর্ধর্ষ কোরায়শরাই ঐ দলের হস্তে পরাজিত হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদেরকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, মুহাম্মদই সত্য; তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ-লড়াই করিয়া জয়ী হইতে পারিব না।

আরবের বিভিন্ন গোত্র এই ধরনের জল্পনা-কল্পনা এবং আন্দোলন-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অপেক্ষমান দর্শকের ভূমিকায় তাকাইয়া রহিয়াছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বিস্ময়কর সংবাদ তাহাদের গোচরে আসিয়া গেল যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কা অধিকার করিয়া লইইয়াছেন। মক্কার সর্বপ্রধান সর্দার আবু সুফিয়ান মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। দুর্ধর্ষ মক্কাবাসীরা ইসলামের দুয়ারে ভিড় জমাইয়া ইসলামের ছায়ায় স্থান সংগ্রহ করিতেছে। আবরাহার হাতী-ঘোড়া ও অসংখ্য সৈন্য যে কা'বা অধিকার করিতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল; আজ অনায়াসে সেই কা'বা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অধিকারে আসিয়া গিয়াছে এবং কা'বা ঘরে স্থাপিত প্রতিমাগুলি অধঃমুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানের

ঠাকুর-দেবতাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। যেই মুহাম্মদ এবং তাঁহার দল নিঃস্ব নিঃসম্বলরূপে মক্কার পথেঘাটে অত্যাচারিত ছিল, আজ তিনি মক্কার সর্বেসর্বা। যেই সাফা পর্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়া মুহাম্মদ (সঃ) মক্কার সমাজপতিদের ইসলামের ডাক দিয়াছিলেন আর তাহারা ঘৃণা, তিরস্কার ও ধমকের দ্বারা তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল, আজ সেই সাফা পর্বতের পাদদেশেই ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গ করায় লালায়িত হইয়া মক্কার লোকেরা আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। মক্কা বিজয় দ্বারা এইভাবে বিস্ময়জনক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। তাই আরবের বহু গোত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে মদীনায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিতে লাগিল। তৃতীয় খণ্ড ১৫৫৩ নং হাদীছে এই তথ্যের বিবরণ উল্লেখ রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, "মক্কা বিজয়ের পর আপনি দেখিতে পাইবেন দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করিতেছে।" (সূরা নাসর)

হিজরী অষ্টম বৎসরের শেষার্ধে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হইয়াছে, তাই নবম বৎসরে ঐরূপ প্রতিনিধি দল আগমনের হিড়িক পড়িয়া গেল। এমনকি ইতিহাসে হিজরী নবম বৎসরকে "আমুল উফুদ" ডেপুটেশন বা প্রতিনিধি দল আগমনের বৎসর বলা হয়।

হিজরী পঞ্চম বৎসর খন্দকের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশাল সম্মিলিত আরব বাহিনী ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবে ইসলাম এবং মুসলমানদের সুদৃঢ় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন হইতেই সময় সময় স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে কোন কোন গোত্রের প্রতিনিধি দল আসিতেছিল। সর্বপ্রথম পঞ্চম হিজরী সনে মোযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল। উক্ত প্রতিনিধি দলে চারি শত লোক আসিয়াছিল। তাঁহারা সকলে স্বেচ্ছায় একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী (সঃ) তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমাদের নিজ দেশ হইতে হিজরত করিতে হইবে না। (কারণ, তাহাদের বস্তিতে মুসলমানগণ স্বাধীন শক্তিশালী হইবেন।) তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদের স্থানে ফিরিয়া যাও। সেমতে তাঁহারা ইসলাম লইয়া নিজ বস্তিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (তাবাকাত, ১-২৯১)

এইভাবে পঞ্চম বৎসর হইতে প্রতিনিধি দলের আগমন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু কদাচিৎ। নবম বৎসরে ব্যাপক আকারে এবং বহু সংখ্যক প্রতিনিধি দলের আগমন হয়। ইতিহাসে ঐরূপ ৭২টি প্রতিনিধি দল আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায় (তাবাকাত, প্রথম খণ্ড)। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল- তায়েফের প্রতিনিধি দল, তামীম প্রতিনিধি দল, বনু হানীফার প্রতিনিধি দল, ইয়ামান প্রতিনিধি দল এবং তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

গোত্রীয় বা বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধি দল ছাড়াও মদীনায় নবীজী (সঃ) সমীপে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমনও অনেক হইয়াছে। যথা-

(১) ফারওয়া ইবনে মিস্‌সীক (রাঃ) তিনি কিন্দা বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন নিজ গোত্রের প্রধান ও শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি কিন্দা বংশীয় রাজার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়াছি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে নিজের গোত্র এবং পার্শ্ববর্তী আরও দুইটি গোত্রের শাসনকর্তা মনোনীত করিয়া তাঁহার দেশের যাকাত ইত্যাদির কালেক্টররূপে খালেদ ইবনে সায়ীদ (রাঃ) ছাহাবীকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২) আম্‌র ইবনে মা'দীকারেব তিনি যোবায়দ গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি তাঁহার এক বন্ধু কায়সকে বলিলেন, হে, কায়স! শুনিতে পাইলাম কোরায়শ বংশে মুহাম্মদ (সঃ) নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন। আমাকে নিয়া তাঁহার নিকট চল, তাঁহার পূর্ণ তথ্য অবগত হইব; প্রকৃতই যদি তিনি নবী হইয়া থাকেন তবে তাহা আমাদের চোখে লুক্কায়িত থাকিবে না- প্রকাশ পাইয়া যাইবে; আমরা তাঁহার দাবী মানিয়া লইব। আর যদি ঐ দাবীর বিপরীত কিছু হয় তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিব। বন্ধু কায়স তাঁহার কথায় সাড়া দিল না, তবুও তিনি একাই যাত্রা করিলেন এবং নবীজীর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

(৩) জরীর ইবনে আবদুল্লাহ, (রাঃ) -ইয়ামানের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি

নবীজীর (সঃ) তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই তাঁহার আলোচনায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, অবিলম্বেই এই দরজা দিয়া ইয়ামানের এক উত্তম ব্যক্তি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন।

জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবীজীর মজলিসে পৌঁছিলে পর নবীজী (সঃ) আমার নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জরীর ! কি উদ্দেশে আসিয়াছেন? আমি উত্তর করিলাম, আপনার হস্তে ইসলাম গ্রহণ উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তখন নবীজী (সঃ) আমার জন্য একখানা কম্বল বিছাইয়া দিলেন এবং লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া (একটি সুন্দর আদর্শ শিক্ষাদানে) বলিলেন, তোমাদের নিকট কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিলে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তৎপর হইবে। অতপর নবীজী (সঃ) আমাকে কতিপয় বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাইলেন–

(১) মনে-মুখে ঘোষণা দেওয়া যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং আমি মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। (২) আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাল-মন্দের তকদীর সম্পর্কে ঈমান স্থাপন করা। (৩) নামায পড়া। (৪) যাকাত দান করা। আমি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহ্বানে প্রত্যেকটি বস্তু গ্রহণ করিলাম।

নবীজী (সঃ) আমার প্রতি এতই অমায়িক ও সদয় ছিলেন যে, তিনি যখনই আমাকে দেখিতেন আমার প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া মুচকি হাসি হাসিতেন।

(৪) ওয়ায়ল ইবনে হুজর (রাঃ)– তিনি ইয়ামানের রাজবংশীয় একজন ছিলেন। আরব সাগরের উপকূলবর্তী হায্রামাউত এলাকার একজন বিশিষ্ট জমিদার। তাঁহার আগমনের পূর্বেই নবী (সঃ) ছাহাবীগণকে তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইলেন। তিনি পৌঁছিলে নবী (সঃ) তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নিজের অতি নিকটে বসাইয়াছিলেন এবং বসিবার জন্য চাদর বিছাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার বংশধরের জন্য মঙ্গল কল্যাণের বিশেষ দোয়া করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমগ্র হায্রামাউত এলাকার জমিদারদের প্রধান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মোআবিয়া (রাঃ) ছাহাবীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

একটি চমকপ্রদ বিষয় ঃ ওয়ায়ল (রাঃ) রাজবংশীয় লোক, সবেমাত্র মুসলমান হইয়াছেন। সেই যুগের ও পরিবেশের বংশীয় উগ্রতা মন-মগজ হইতে মুছিতে কিছু বিলম্ব অবশ্যই হইবে। মোআবিয়া (রাঃ) তাঁহার সঙ্গেই আছেন। তিনি পায়ে হাঁটিয়া চলিতেছেন। রৌদ্রের উত্তাপে যখন মরুভূমির পথ উত্তপ্ত হইয়া গিয়াছে তখন মোআবিয়া (রাঃ) তাঁহার নিকট পথের উত্তাপের অভিযোগ করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমার উটের ছায়ায় চলিতে থাকুন। মোআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, তাহাতে কষ্টের কি লাঘব হইবে? আপনি আমাকে আপনার বাহনের পিছনে বসাইয়া নিলে ভাল হয়। ওয়ায়ল (রাঃ) তাঁহাকে উত্তরে বলিলেন, চুপ থাকুন; রাজবংশীয় লোকদের সহিত এক বাহনে বসিবার মর্যাদা আপনার নাই।

যুগের পরিবর্তনে এই মোআবিয়া (রাঃ) পরবর্তীকালে আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মুসলেমীন হইলেন। তখনও ওয়ায়ল (রাঃ) জীবিত আছেন। তিনি একবার মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাক্ষাতে আসিলেন। মোআবিয়া (রাঃ) তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নিজের নিকটেই বসাইলেন না শুধু, বরং তাঁহাকে নিজের আসনে নিজের সঙ্গে বসাইলেন এবং বহু মূল্যবান উপহার তাঁহার নিকট পেশ করিলেন। ওয়ায়ল (রাঃ) বলেন, আমি তখন (লজ্জিত হইয়া) মনে মনে ভাবিতেছিলাম, ঐ দিন যদি আমি তাঁহাকে বাহনের অগ্রভাবে বসাইতাম।

৫। যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী– তিনি তাঁহার গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতপর আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার গোত্রের প্রতি সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে। হুযুর! এখনই সৈন্যবাহিনী ফেরত আনিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমার গোত্রের ইসলাম ও আনুগত্য সম্পর্কে আমি জামিন থাকিলাম। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তুমি যাও এবং আমার পক্ষ হইতে সৈন্যবাহিনীকে ফিরাইয়া নিয়া আস। আমি আরজ করিলাম, আমার বাহনটি অতিশয় পরিশ্রান্ত; সেমতে নবী (সঃ) অন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া সৈন্যবাহিনী ফেরত নিয়া আসিলেন।

অতপর আমি আমার গোত্রের নিকট পত্র লিখিয়া দিলাম; অবিলম্বে সমগ্র গোত্রের পক্ষ হইতে তাহাদের ইসলাম ও আনুগত্যের সংবাদ লইয়া প্রতিনিধি দল নবীজীর নিকট উপস্থিত হইল। এতদৃষ্টে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার গোত্র ত তোমার খুবই অনুগত! আমি বলিলাম, আল্লাহ তাআলাই তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তোমাকেই তোমার গোত্রের শাসনকর্তা নিয়োগ করিব; এই মর্মে নিয়োগপত্ররূপে একখানা লিপিও তিনি আমাকে প্রদান করিলেন। আমি আরজ করিলাম, আমার ব্যয় বহনের জন্য তাহাদের সদকা ভাণ্ডার হইতে কিছু অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন। সেই মর্মেও তিনি আমাকে একখানা লিপি লিখিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে এক এলাকার লোক আসিয়া নবীজীর নিকট তাহাদের শাসনকর্তা সম্পর্কে অভিযোগ করিল যে, তিনি অতীতের আক্রোশে আমাদেরকে উৎপীড়ন করেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, ঈমানদার লোকের জন্য শাসনক্ষমতায় উপকার নাই। নবীজীর এই কথাটি আমার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া রহিল। ইতিমধ্যেই আর একটি ঘটনা ঘটিল। এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইল। নবীজী (সঃ) তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অন্যের নিকট চাহিবে, উহা তাহার মাথা ব্যথা ও পেটের পীড়ার (ভীষণ যন্ত্রণার) কারণ হইবে। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, আমাকে সদকা ভাণ্ডার হইতে কিছু দান করুন। তদুত্তরে নবীজী (সঃ) বলিলেন, সদকার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আট শ্রেণীর লোক নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; তুমি যদি উহার কোন শ্রেণীভুক্ত হও তবে তোমাকে দিব। নবীজীর এই কথাটিও আমার অন্তরে বিদ্ধ হইল এবং আমি ভাবিলাম, আমি ত সচ্ছল, অথচ সদকার ভাণ্ডার হইতে অংশ গ্রহণের জন্য আমি নবীজী (সঃ) হইতে অনুমতি লিপি চাহিয়া লইয়াছি।

এই ভাবনা-চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ফজর নামাযান্তে আমি নবীজীর (সঃ) লিপিদ্বয় লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এই উভয় লিপির মর্ম হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করি। নবীজী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কারণ তোমার অন্তরে কি উদিত হইয়াছে। আমি আরজ করিলাম, আপনার এই বাণী আমি শুনিয়াছি– "ঈমানদারের জন্য শাসনক্ষমতায় উপকার নাই," আমি ত আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি ঈমান রাখি। আপনার এই বাণীও শুনিয়াছি– "সচ্ছলতা সত্ত্বেও যেব্যক্তি অন্যের নিকট চাহিবে, তাহা তাহার জন্য মাথা ব্যথা ও পেটের পীড়ার কারণ হইবে; আমি সচ্ছল হইয়াও আপনার নিকট চাহিয়াছি।

নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা বাস্তব; অতএব তুমি সেমতে চিন্তা করিয়া হয় গ্রহণ কর না হয় ত্যাগ কর। আমি আরজ করিলাম, আমি ত্যাগ করিলাম। নবীজী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে গোত্রপ্রধান নিযুক্ত করিব তাহা তুমি বলিয়া দাও। আমি প্রতিনিধি দলে আগন্তুকদের মধ্য হইতে একজনের নাম প্রস্তাব করিলাম; তিনি তাঁহাকেই গোত্রপ্রধান নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অতপর আমি আরজ করিলাম, আমাদের গোত্রেসমূহ একটিমাত্র কূপ রহিয়াছে; বর্ষাকালে উহার পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে যথেষ্ট হয় না; পানির জন্য আমাদের অন্যত্র যাইতে হয়। এখন আমরা মুসলমান; চতুষ্পার্শ্বস্থ গোত্রে অমুসলিম, তাহারা আমাদিগকে পানি দিবে না। নবী (সঃ) আমাকে বলিলেন, সাতটি কাঁকর নিয়া আস; তিনি সেই কাঁকরগুলি নিজ হস্তে মর্দন করতঃ উহাতে দোয়া করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, এই কাঁকরগুলি নিয়া যাও; এক একটি কাঁকর আল্লাহর নাম জপপূর্বক কূপে ফেলিয়া দিবে। আমরা তাহাই করিলাম; তখন হইতে সর্বদা আমাদের কূপে এত অধিক পরিমাণ পানি থাকিত যে, কোন সময়ই উহার তলা দেখা সম্ভব হইত না।

(৬) তারেক ইবনে আবদুল্লাহ– তিনি নবীজী (সঃ)-কে নবুয়তের প্রথমজীবনে এক বার অতি করুণ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন– আমি "জুল-মজায" নামক আরবের প্রসিদ্ধ মেলা বা হাটে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তথায় দেখিলাম, একজন লম্বা জুব্বাধারী লোক এই আহ্বান করিয়া বেড়াইতেছেন–

"হে মানবগণ! সকলে বল, আল্লাহ এক– অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই; তাহা হইলে তোমরা সাফল্য লাভ করিবে।" সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিলাম যে, আর একটি লোক পিছনে পিছনে তাঁহার প্রতি পাথর ছুঁড়িয়া মারিতেছে এবং বলিতেছে, হে লোকসকল! সাবধান– কেহ ইহার কথা শুনিও না, সে মহা মিথ্যাবাদী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, আহ্বানকারী ব্যক্তি হইলেন হাশেম বংশের একজন সুপুরুষ, যিনি নিজকে আল্লাহর প্রেরিত রসূল বলিয়া থাকেন। আর দ্বিতীয় লোকটি তাঁহারই পিতৃব্য আবদুল ওয্যা– আবু লাহাব।

এই ঘটনার পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইয়াছে– বহু লোক মুসলমান হইয়াছে এবং মক্কা হইতে মুসলমানগণ সকলেই হিজরত করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এই সময় আমরা আমাদের বস্তি "রাবাজা" হইতে কতিপয় লোক খেজুর ক্রয়ের জন্য মদীনায় যাত্রা করিলাম। মদীনার বাগ-বাগিচার নিকটবর্তী হইয়া আমরা বিশ্রাম করিবার জন্য ময়লা কাপড় বদলাইতে অবতরণ করিলাম। এই সময় এক চাদর পরিধানে আর এক চাদর গায়ে একজন লোক আমাদের নিকট আসিয়া সালাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কাফেলাটি কোথা হইতে আসিয়াছে, আর কোথায় যাইবে? আমরা বলিলাম, রাবাজা হইতে আসিয়াছি , মদীনায় যাইব। উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, খাদ্য ক্রয়ের জন্য যাইব।

কাফেলায় একজন মহিলাও ছিল, আর আমাদের সঙ্গে বিক্রির জন্য একটি লাল রংয়ের উট ছিল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, উটটি বিক্রি হইবে কি? আমরা বলিলাম, হা– এ পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি হইবে। লোকটি মূল্য সম্পর্কে কোনরূপ কাটাকাটি না করিয়া উটের নাশারজ্জু ধরিয়া উট লইয়া চলিয়া গেলেন। লোকটি উট লইয়া আমাদের দৃষ্টির আড়াল হইতেই চৈতন্য হইল– উট ক্রেতা আমাদের পরিচিত নহে ত, আর মূল্য না লইয়া তাঁহাকে উট দিয়া দিলাম। আমাদের সঙ্গী মহিলাটি বলিল, চিন্তার কারণ নাই, লোকটি নূরানী চেহারার– তাঁহার মুখমণ্ডল যেন পূর্ণিমার চাঁদ। এই লোক প্রতারক হইবে না; উটের মূল্যের জন্য আমি দায়ী থাকিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রথমে নিজ পরিচয় দিলেন যে, আমি তোমাদের বিশ্ব মানবের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। অতপর বলিলেন, এই নাও খেজুর; ইহা হইতে তোমরা সকলে পেট পুরিয়া খাও, অতপর তোমাদের প্রাপ্য উটের বিনিময় পূর্ণ ওজন করিয়া নাও। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমরা যথাসময় মদীনা নগরে গমন করিয়া মসজিদের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তথায় দেখি– সেই লোক মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া জনমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেছেন। আমরা শেষের এই কথা কয়টি শুনিতে পাইয়াছিলাম– "হে লোকসকল! অভাবগ্রস্ত কাঙ্গালদের দান কর, ইহা তোমাদের পক্ষে বিশেষ কল্যাণজনক। স্মরণ রাখিও, উপরের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাত হইতে উত্তম। পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নী ও অন্যান্য স্বজনবর্গের প্রতিপালন করিবে।"

ইতিমধ্যেই মদীনার একজন মুসলমান উপস্থিত হইয়া আমাদের উপর এক মস্ত বড় অভিযোগ চাপাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই কাফেলার লোকদের উপর পূর্ব আমলের একটি খুনের দাবী আমাদের রহিয়াছে। অন্ধকার যুগের রীতি ছিল, হত্যাকারী হইতে প্রতিশোধ লওয়া সহজ না হইলে তাহার গোত্র হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইত।

রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই অভিযোগ নাকচ করিয়া দিয়া বলিলেন, পিতা পুত্রের অপরাধে বা পুত্র পিতার অপরাধে প্রতিশোধ গ্রহণের পাত্র হইবে না (দূর সম্পর্কীয়দের ত কোন কথাই নাই)।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এইরূপ মহানুভবতা ও অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তারেক ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁহার সঙ্গীদের ন্যায় বহু লোক ইসলামের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(উল্লিখিত সমুদয় ঘটনা বেদায়া, ৪৭০-৪৮৬ হইতে অনূদিত)

স্বাধীন মক্কায় মুসলমানদের প্রথম হজ্জ

আবু বকর (রাঃ)-এর নেতত্বে হজ্জ যাত্রা (পৃঃ ৬২৬)

অনেকের মতে নবম হিজরীর প্রথম দিকেই, কাহারও মতে আরও অনেক পূর্বেই হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান আসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পূর্বে ত মুসলমানদের জন্য মক্কায় হজ্জ করিতে যাওয়া সহজসাধ্য ছিল না, আর নবম হিজরীতে নবীজীর (সঃ) জন্য হজ্জ সমাপনে কোন বিশেষ অসুবিধা ছিল। অনেকের মতে হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান নবম হিজরীর একেবারে শেষ দিকে আসিয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে হজ্জ করার নিয়ম ত পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। সেমতে নবীজী (সঃ) শুধু সাধারণ নিয়মানুসারে মুসলমান হাজীদের একটি দল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে নবম হিজরী সনে হজ্জ সমাপনে যাত্রা করিয়াছিল। এই হজ্জে নবীজী (সঃ) অংশগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু মক্কাস্থ মিনায় কোরবানী দেওয়ার জন্য বিশটি উট আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৩-৩৯)

আনুষ্ঠানিকরূপে পরিচালিত ও নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রেরিত হাজী কাফেলা স্বাধীন মক্কায় সর্বপ্রথম ইহাই ছিল। অবশ্য অষ্টম হিজরীর হজ্জ মওসুমের পূর্বেই রমযান মাসে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ঐ বৎসরও মুসলমান মোশরেক সম্মিলিতভাবে হজ্জ আদায় করা হইয়াছিল। তখন মক্কার গভর্নররূপে আত্তাব ইবনে আসীদ (রাঃ) নবীজী (সঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ছিলেন। পদাধিকারবলে তিনিই ঐ বৎসর মুসলমান হাজীগণের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। (যোরকানী, ৩-৯৪)।

কিন্তু ঐ বৎসর হজ্জ শুধু গতানুগতিক প্রথারূপে ছিল। তাহার কোন ব্যবস্থাই নবীজী (সঃ) কর্তৃক আনুষ্ঠানিকরূপে পরিচালিত ছিল না- যেরূপ ছিল নবম হিজরীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে পরিচালিত হজ্জ।

অষ্টম হিজরী সনে মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী সমুদয় এলাকার বিজয় দ্বারা আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তাই এখন আল্লাহ তাআলার এর একটি বিশেষ আদেশ-

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাও, যাবত না আল্লাহর দ্বীনে বাধাদানের শক্তি রহিত হইয়া যায় এবং সর্বত্র আল্লাহর দ্বীনের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত হয়।"

এই আদেশ বাস্তবায়ন পরিকল্পনার কাজে বিশেষ তৎপরতার সহিত অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সেমতে অষ্টম হিজরীতে শক্তি-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই নবম হিজরী সনে উক্ত পরিকল্পনার কাজ দ্রুতগতিতে চালানো হয়। নবম হিজরীর হজ্জ পর্যন্ত কাফেরদের জন্য সাধারণ সুযোগ ভোগের অবকাশ ছিল। যথা-

(১) কাফেররাও মুসলমানদের সহিত একত্রে হজ্জ করিত।

(২) হজ্জে কাফেররা তাহাদের গর্হিত নীতি- যেমন, উলঙ্গ হইয়া তওয়াফ করা পালন করিয়া যাইত।

(৩) অনেক অনেক গোত্রের সহিত রসূলুল্লাহ (সঃ) অনির্দিষ্টকাল বা নির্দিষ্টকালের জন্য "যুদ্ধ নহে চুক্তি" সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা ইসলামের সম্মুখে নতিস্বীকার ছাড়াই সর্বত্র পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া যাইত।

(৪) কাফেররা সমগ্র আরবে, এমনকি পবিত্র হরম শরীফেও নির্বিবাদে বসবাস এবং স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইত।

৩ এবং ৪ নম্বরের সুযোগ ইসলামের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ক্ষতিকর ও আশঙ্কার বস্তু ছিল। কারণ, পবিত্র হরম শরীফ ইসলামদ্রোহীদের সর্বপ্রধান ঘাঁটি ছিল। অতএব তথা হইতে ইসলামদ্রোহীদের নাম-নিশানা চিরতরে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলা একান্ত কতব্য। আর সমগ্র আরবই ইসলামের কেন্দ্র ও রাজধানী রূপ; তথা হইতেও ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ইসলামদ্রোহীদের উচ্ছেদ প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে বিরাট বলিষ্ঠ সুদীর্ঘ ঘোষণা পবিত্র কোরআনের ত্রিশটি আয়াতরূপে অবতীর্ণ হয়। উক্ত আয়াতসমূহের তেজস্বী সুর ও কঠোর ভাষার প্রভাব-প্রতাপই কাফের মোশরেকদের ভীত সন্ত্রস্ত কম্পমান করিয়া তুলিতে এবং আভ্যন্তরীণ শত্রু মোনাফেক ও বাহিরের লোলুপ শক্তিগুলিকে চিরতরে নিরাশ নিস্তব্ধ করিতে যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন–

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهُ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ـ وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ ـ

অর্থ ঃ "যে মোশরেকদের সহিত সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত রহিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের পক্ষ হইতে সমুদয় চুক্তি বাতিলের সুস্পষ্ট ঘোষণা জারি করা হইল। (আর যাহাদের সঙ্গে কোন চুক্তি নাই তাহাদের প্রশ্ন ত আরও সুস্পষ্ট। উভয় শ্রেণীর কাফেরদের প্রতি চরম পত্র–) তোমরা এই দেশে আর শুধু চারি মাস অবাধে চলাফেরার সুযোগ ভোগ করিতে পারিবে। (ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম; সুযোগ দিয়াছে। ইতিমধ্যে তোমরা হয় ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ কব, না হয় এই দেশ ত্যাগ কর।) জানিয়া রাখ– তোমরা (আল্লাহর রসূলকে তথা) আল্লাহকে হার মানাইতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরে পদদলিত করিবেন।

আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের পক্ষ হইতে মহান হজ্জের দিনে সর্ববৃহৎ জনসমাবেশে দৃঢ় কণ্ঠের ঘোষণা জারি করা হইতেছে যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল মোশরেকদের হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। অবশ্য যাহাদের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের চুক্তি রহিয়াছে এবং তাহারা কোন প্রকারে চুক্তি ক্ষুণ্ন করে নাই তাহাদের জন্য চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সুযোগ বহাল থকিবে। এই কথাটি মাত্র ঐ শ্রেণীর জন্য যাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া অচিরে আপনা আপনিই সুযোগ রহিত হইয়া যাইবে। অন্য সব কাফের-মোশরেকদের সম্পর্কে মুসলমানদিগকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হইল এই যে–

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ـ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ـ

অর্থ ঃ "কাফেরদের জন্য প্রদত্ত সুযোগের চারিটি মাস– যে সময় তাহাদের আক্রমণ করা নিষিদ্ধ; এই চারিটি মাস অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পরই মোশরেকদের পাকড়াও কর, তাহাদের ঘেরাও কর এবং তাহাদের ঘায়েল করার প্রতিটি সুযোগের অপেক্ষায় থাক। হাঁ, যদি তাহারা কুফরী-শেরেকী হইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দান করে তবে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান কর।

(পারা–১০ সূরা-তওবা)

অনেকের মতে আবু বকর (রাঃ) মক্কাভিমুখে যাত্রা করার পর এই তেজালো ঘোষণা ও চরম পত্রের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। আর কাহারও মতে পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং হয়ত মিনায় বৃহত্তম জনসমাবেশে তাহা ঘোষণার জন্য নবীজী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে বলিয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু আবু বকর

(রাঃ) যাত্রার পর রাষ্ট্রীয় চুক্তি বাতিল ঘোষণার গুরুত্ব প্রদর্শনে আন্তর্জাতিক বিধি মোতাবেক রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিশেষ দূতরূপে নবীজী (সঃ)-এর নিজস্ব বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর উপর সওয়ার করিয়া আলী (রাঃ)-কে ঐ ঘোষণা আবৃত্তির জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। আল্লাহর ঘর– কা'বার নগরী মক্কাকে মূল কেন্দ্র করিয়া সমগ্র আরবকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার বাস্তব পদক্ষেপে নবীজী (সঃ) অগ্রসর হইলেন এবং পরিকল্পনা করিলেন যে, (১) আল্লাহর সঙ্গে কাফের মোশরেকদের কোন সম্পর্ক নাই, সেই সম্পর্কের একমাত্র অধিকারী মোমেন-মুসলমানগণ– ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। (২) আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফকে অন্ধকার যুগের কুফরী রীতি-নীতি হইতে পূর্ণ পাক পবিত্র করা হইবে। (৩) মক্কার এলাকাকে এখন হইতেই চিরতরে কাফের-মোশরেক হইতে মুক্ত রাখার সুব্যবস্থা করা হইবে। (৪) সমগ্র আরবকে ঈমান ইসলামের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্ররূপে রূপায়িত করার জন্য তথা হইতে উহার বিরোধী সকলকে ধাপে ধাপে উচ্ছেদ করিতে হইবে; যেন ভিতরে থাকিয়া ইসলামের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করিতে সুযোগ না পায়। এই চারিটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রসূলুল্লাহ (সঃ) চারিটি নির্দেশ দিয়া তাহা ঘোষণার জন্য ব্যক্তিগত বিশেষ দূতরূপে আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করিলেন। ঘোষণা চারিটি এই–

(১) মোমেন ব্যতীত অন্য কেহ বেহেশতে যাইতে পারিবে না। (২) কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা শরীফের তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করিতে পারিবে না। (৩) এই বৎসরের পরে আর কোন কাফের-মোশরেক হজ্জ করিতে পারিবে না। (৪) বিশেষ ঘোষণা– পবিত্র কোরআনের ১৩ পারা সূরা তওবা বা বারাআতের প্রথম আয়াতসমূহ– যাহা মোশরেকদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা এবং চারি মাসের মধ্যে হরম শরীফ হইতে বরং সমগ্র আরব হইতে মোশরেক পৌত্তলিকদের দেশ ত্যাগ করার আদেশ ছিল। আরবের মোশকেরদের সতর্কীকরণও ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ কর, না হয় আরব দেশ ত্যাগ কর, অন্যথায় হত্যা, বন্দী বা ঘেরাওয়ের সম্মুখীন হওয়ার তথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (আসাহহুস সিয়ার– ৪৪৫)

৩ নং আদেশটিও বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের সূরা তওবারই সুস্পষ্ট নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ـ

অর্থ ঃ"হে মোমেনগণ! নিশ্চয় মোশরেকরা হইতেছে অপবিত্রই অপবিত্র, সুতরাং তাহারা যেন এই বৎসর হজ্জের পরে আর হরম শরীফ মসজিদের নিকটেও আসিতে না পারে।"

এই চারিটি আদেশ লইয়া নবীজীর (সঃ) ব্যক্তিগত বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর উপর আরোহণপূর্বক আলী (রাঃ) যাত্রা করিলেন। আবু বকর (রাঃ) মদীনা হইতে সত্তর মাইলেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া "আরজ" নামক জায়গায় পৌঁছিলে আলী (রাঃ) দ্রুত যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। আবু বকর (রাঃ) ফজরের নামায আরম্ভ করার জন্য দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় নবীজীর (সঃ) বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর আওয়াজ তিনি ঠাহর করিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, হয়ত আমার যাত্রার পরে নবীজী (সঃ)-এর হজ্জে আগমনের ইচ্ছা হইয়াছে, তাই তিনি আসিয়াছেন। অতপর যখন আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাক্ষাত পাইলেন তখন আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, উপরস্থ হইয়া আসিয়াছেন, না অধীনস্থ? আলী (রাঃ) উত্তর করিলেন, আপনার অধীনস্থ হইয়া আসিয়াছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে পাঠাইয়াছেন সন্ধি-চুক্তি বাতিলের ঘোষণা শুনাইবার জন্য।

সেমতে আবু বকর (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) একত্রে চলিতে লাগিলেন। হজ্জ পরিচালনার সম্পূর্ণ নেতৃত্ব আবু বকর (রাঃ)-ই প্রদান করিলেন; আলী (রাঃ) ১০ই যিলহজ্জ মিনায় জামরা আকাবার নিকট জনমণ্ডলীর বৃহত্তম সমাবেশে দাঁড়াইয়া নবী (সঃ) প্রদত্ত ঘোষণাসমূহ প্রচার করিয়া যাইতে লাগিলেন। আলী রাযিয়াল্লাহু

তাআলা আনহুর এই কার্যে তাঁহার সাহায্যার্থ অন্যদেরকে যেমন– আবু হোরায়রা (রাঃ)-কেও আবু বকর (রাঃ) নিয়োগ করিয়াছিলেন । (১ম খণ্ড ২৪৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

হজ্জ সমাপনান্তে আবু বকর (রাঃ) মদীনায় পৌছিয়া নিজ অন্তরের একটি ভীতি দূরীকরণার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার প্রতি কোন অভিযোগে আল্লাহর আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল কি? নবী (সঃ) তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, না– তবে আমি ভাল মনে করিয়াছিলাম যে, আন্তর্জাতিক সন্ধি চুক্তি বাতিলের ঘোষণাটা আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব লোক মারফত হউক। (আসাহহুস সিয়ার– ৫৪৭)

অর্থাৎ শুধু উক্ত নিয়ম অনুসরণে আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

হিজরী দশম বৎসর
মুসলমানদের পরম আনন্দ ও ইসলামের
চরম গৌরবের বৎসর

ইসলামের প্রতি সম্ভাব্য হুমকিসমূহ দমাইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভিযান পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে। বহির্বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি রোমানরা নবম হিজরীতে মদীনার প্রতি দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া অভিযানের শুধু পকিল্পনা করিয়াছিল; খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীজী (সঃ) চল্লিশ হাজার আত্মোৎসর্গকারী ভক্তবৃন্দ লইয়া দীর্ঘ তিন মাইল পথ অতিক্রম করতঃ রোমানদের নাকের উপর তবুক নামক এলাকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ক্যাম্প করিয়া বিশ দিন অবস্থান করিলেন। শত্রুদের মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; সীমান্তে সমাবেশিত শত্রু সৈন্য পশ্চাৎপদ হইয়া গেল। মদীনা আক্রমণ করার সাধ তাহাদের চিরতরে মিটিয়া গেল, অধিকন্তু তাহাদের উপর এবং এলাকার উপর মুসলিম বাহিনীর পূর্ণ প্রভাব জগদ্দল পাথররূপে চাপিয়া গেল। এমনকি রোম সীমান্তে আবরদের যেসব দেশীয় রাজ্য দীর্ঘ দিন হইতে রোম সম্রাটের আশ্রিত ও অনুগত ছিল এবং যেসব গোত্র রোম সম্রাটের পক্ষাবলম্বী ছিল, সকলেই ইসলামী রাষ্ট্রের করতলে আসিয়া করদ রাজ্যে পরিণত হইয়া গেল। এইভাবে রোম সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত এলাকা মদীনার শাসনে আনয়নপূর্বক গোটা আরব উপদ্বীপের উপর ইসলামের কর্তৃত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবুক অভিযানে যুদ্ধ না করিয়া চরম বিজয়লাভে নবীজী (সঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

নবীজী (সঃ)-এর এই রাজনৈতিক চরম বিজয়ে আরবের মুমূর্ষু কুফরী শক্তি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগে বাধ্য হইল। মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসলামের এই চরম বিজয় আরবে শেরেক ও কুফরী শক্তির কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; বহিঃশক্তির সাহায্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার যে দুরাশা আরবের কাফের-মোশরেকদের ছিল, তবুক অভিযানের ফলাফল উহা হইতেও তাহাদিগকে চিরতরে নিরাশ করিয়া দিল। এখন ইসলাম সত্য সত্যই বলিষ্ঠ ও বিজয়ী; ইসলামের বিজয়ধ্বনিতে সমগ্র বহির্বিশ্ব প্রকম্পিত এবং ইসলামের জয়জয়কারে আরব উপদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখরিত। দীর্ঘ দশ বৎসরের যুদ্ধের সকল সীমান্তই এখন নীরব। তেইশ বৎসরকাল ধরিয়া চতুর্দিকে যেই আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহা নিভিয়া গিয়াছে। উহার ধূম্রজাল কাটিয়া গিয়া সমগ্র আরব উপদ্বীপের আকাশে ইসলামের পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হইয়াছে এবং সেই আলোকে আলোকিত হইয়াছে চতুর্দিক। তাই বিদায় নিতে হইয়াছে কুফর ও শেরকের অন্ধকারকে। আকাশ হইতে আলো নামিয়া আসিলে ধরণীর জমাট বাঁধা অন্ধকারকে নীরবে বিদায় লইতেই হয়।

এদিকে কপট মোনাফেক দলের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও জাহান্নামে চলিয়া গিয়াছে; তাহার মৃত্যুতে ইঁদুর মোনাফেক দলের অবস্থাও কাহিল– এইসব নবম হিজরীর অবস্থা।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার পথ নবীজী (সঃ) সুগম করিয়াছেন, ইসলাম পালন করার বিধি-ব্যবস্থার অনুশীলন এবং শিক্ষাদান ও নবীজী (সঃ) পূর্ণ করিয়াছেন। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি ফরয-ওয়াজিব এবং

হালাল-হারামের শিক্ষাদানও কার্যে রূপায়ণ হাতে কলমে পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। এখন পূর্ণাঙ্গ ইসলামের শুধু একটি স্তম্ভ– একটি রোকন বা মহাফরয হজ্জ যাহা মুসলমানদের সারা জীবনে মাত্র একবার করিতে হয়, উহার অনুশীলন ও বাস্তব রূপায়ণ অবিশিষ্ট রহিয়াছে। দশম হিজরীতে নবী (সঃ) মুসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া হজ্জ পালনের ইচ্ছা করিলেন। নবীজী (সঃ)-কে দিবালোকে, স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে, খোলা ময়দানে, মুক্ত পরিবেশে মক্কায়, মিনায়, আরাফায় মোযদালেফায় এবং এইসব এলাকার পথে পথে ধীরস্থিররূপে লক্ষাধিক জনতাকে হজ্জের নিয়ম-কানুন কার্যতঃ দেখাইতে হইবে। জনতার ভিড়ে তাহাদের সঙ্গে সর্বদা নবীজীকে মিশিয়া থাকিতে হইবে। তাই নবীজী (সঃ)-এর নিরাপত্তার বাহ্যিক ব্যবস্থা জোরদার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন নবম হিজরীর বিশেষ ঘোষণাবলীতে পূর্ণরূপে মিটিয়া গিয়াছে। সমগ্র হরম এলাকা হইতে কাফের-মোশরেকদের প্রতিটি প্রাণীর উৎখাত সাধিত হইয়াছে, হরম এলাকায় তাহাদের পা রাখাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। হজ্জ উদযাপনে কাফের মোশরেক একটি প্রাণীও নাই; তাহাদের হজ্জে অংশগ্রহণ চিরতরে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নবীজীর (সঃ) নিরাপত্তার এই বাহ্যিক সুব্যবস্থা সম্পন্ন করার প্রয়োজন বহু কারণের একটি কারণ ছিল, নবীজীর (সঃ) হজ্জ উদ্‌যাপন দশম হিজরী পর্যন্ত পিছাইয়া যাওয়ার।

হজ্জের সময় উপস্থিতির বহু পূর্বেই সর্বত্র প্রচার করা হইল, এই বৎসর নবীজী মোস্তফা (সঃ) হজ্জ পালন করিতে যাইবেন। সর্বত্র এই প্রচারণায় অগণিত জনসমুদ্রের ঢেউ মদীনাকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রায় দেড় লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যে চলিতে লাগিল নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের "কাসওয়া" উষ্ট্রী; পথে পথে আরও অনেক লোকই শামিল হইলেন কাফেলায়। অত্যধিক ভিড় এবং পথে পথে সংখ্যা বর্ধিত হইতেছে, এইরূপ অনেক কারণেই সংখ্যা নির্ধারণকারীদের বর্ণনায় বিভিন্নতা; যাহা এইরূপ ক্ষেত্রে নিতান্তই স্বাভাবিক।

নয় দিন ভ্রমণ করিয়া নবী (সঃ) এই অগণিত মুসলমানসহ মক্কায় পৌঁছিলেন। আজ পবিত্র মক্কায় এক অভিনব দৃশ্য দেখা দিয়াছে। শুভ্র শ্বেত বর্ণের একখানা চাদর গায়ে, পরনে একখানা চাদর– নবীজী (সঃ) এবং ধনী-দরিদ্র এমনকি ক্রীতদাস পর্যন্ত এই একই পরিচ্ছদে প্রায় দুই লক্ষ ভক্তের জামাত। সকলেই নগ্ন পদ, নগ্ন মস্তক এবং সকলের মুখেই লাব্বায়ক' ধ্বনি।

সর্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে, এই মক্কা ভূমিতে যাহারা ছিলেন উপেক্ষিত, উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত তাঁহারাই প্রায় দুই লক্ষ সংখ্যায় আজ মক্কাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। পবিত্র কা'বার তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার পরিক্রমণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আজ মক্কার সমগ্র এলাকায় একটি কাফের মোশরেককেও খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে। যেই দেশে নবীজীর (সঃ) কথা বলার অধিকার ছিল না, আজ সেই দেশের আকাশে-বাতাসে ঝংকৃত হইতেছে নবীজীর (সঃ) কত কত অভিভাষণ।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করিয়াছেন নবীজী (সঃ) এবং তাহা পালন করারও সব নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। অবশিষ্ট ছিল শুধু এই মহান হজ্জ; ইহাও উদযাপিত হইয়া চলিয়াছে মহাসমারোহে। মুসলমানদের এই অভূতপূর্ব মহাসমাবেশের চরম গৌরব ও পরম আনন্দমুখর রাজকীয় পরিবেশে নবীজী (সঃ) কর্তৃক হজ্জ উদযাপনের সাথে সাথে দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করিল। এই মুহূর্তেই মুসলিম জাতির জন্য চির গৌরব ও মহা সুসংবাদ বহন করিয়া পবিত্র কোরআনের এই মহান আয়াতটি অবতীর্ণ হইল–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

অর্থ ঃ "আজ আমি পূর্ণতা দান করিলাম তোমাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে এবং আমার নেয়ামত বা বিশেষ দান এই ইসলামকে পূর্ণ পরিণত করিলাম এবং তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থারূপে ইসলামকেই মনোনীত করিলাম।"

এই হজ্জ উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব মানবের প্রতি বিশ্ব নবীমোস্তফা (সঃ) ৯

যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে এবং ২০ যিলহজ্জ মিনার বিভিন্ন স্থানে যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বিশ্ব শান্তি কল্যাণ ও বিশ্ব মানবের জন্য সর্বোত্তম রক্ষাকবচ। দ্বিতীয় খণ্ডে বিদায় হজ্জ পরিচ্ছেদে আমরা ১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সেই মহা অভিভাষণের মূল বিবরণ ও অনুবাদ করিয়াছি।

হজ্জের মৌলিক কার্যাবলী সমাপনান্তে ১০ যিলহজ্জ বিকাল বেলা শয়তানকে কাঁকর মারার মহাসমাবেশে মানব জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শেষ করিয়া নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জনতার দিকে মুখ করিলেন এবং "বিদায়! বিদায়"!! বলিয়া তাহাদের হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই বিদায়ের মূল তত্ত্ব ও মর্ম বুঝিতে বাকী থাকিল না কাহারও; তাই সকলেই নবীজীর (সঃ) এই সমারোহের হজ্জকে "বিদায় হজ্জ" নামে আখ্যায়িত করিল।

(দ্বিতীয় খণ্ড ৯১০ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

বিদায় হজ্জ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন

বিদায় হজ্জ হইতে মদীনায় উপস্থিত হইবা মাত্রই নবীজী (সঃ) একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিলেন। তাঁহার ভাষণটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। মিনায় শেষ ভাষণ সমাপ্তে জনতাকে নবীজী (সঃ) স্বীয় বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়া আসিয়াছেন; এখন আর এক ইঙ্গিতের বিশেষ প্রয়োজন যে, তাঁহার বিদায়ের পর উম্মতের কাণ্ডারী বা কর্ণধার কে হইবেন। সেই বিশেষ প্রয়োজন মিটাইয়াছেন নবীজী (সঃ) তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে। শুধু তাঁহার পরবর্তী কর্ণধারের ইঙ্গিতের উপরই ক্ষান্ত হন নাই তিনি, বরং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এই প্রয়োজনের সুরাহাকল্পে পরম্পরা কতিপয় নামের ইঙ্গিতও দিয়াছেন এই ভাষণে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বীয় স্নেহাস্পদ উম্মতকে এক ভাষণে নিজ বিদায়ের ইঙ্গিত দানে বিচলিত করিয়া অপর ভাষণে কর্ণধার নির্ধারণে আশ্বস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের কর্তব্যের নির্দেশও দিয়াছেন।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনে মদীনায় পৌঁছিয়া সমবেত উম্মতের সম্মুখে মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও শোক্‌র আদায় করিয়া বলিলেন–

"হে লোকসকল! আবু বকর কখনও আমার প্রতি কোন ত্রুটি করেন নাই; তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি তোমরা লক্ষ্য রাখিও।

হে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমার ছাহাবীগণের বেলায় আমার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করিও বিশেষতঃ যাঁহারা আমার শ্বশুর (যেমন– আবু বকর, ওমর) এবং যাঁহারা আমার দোস্তদার (যেমন, উল্লিখিত গণ্যমান্যগণ) তোমরা সতর্ক থকিও– আমার কোন একজন ছাহাবীর প্রতি অশোভনীয় আচরণের দায়ে। তোমাদের কাহারও যেন আল্লাহ তাআলার নিকট অভিযুক্ত হইতে না হয়।

হে লোকসকল! মুসলমানদের গ্লানি প্রচার হইতে বিরত থাকিও এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহার প্রতি মন্তব্য করিতে ভাল মন্তব্য করিও। (বেদায়া, ৪– ২১৪)

হিজরী একাদশ বৎসর
নবীজী (সঃ)-এর মহাপ্রয়াণ উম্মতের মহাশোক

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব, পরিচয় এবং জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কে যেরূপ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত ছিল, তদ্রূপ তাঁহার তিরোধানের বিবরণও বর্ণিত ছিল। ঐসব কিতাবের জ্ঞানীগণ তাহা সম্যক অবগত ছিলেন। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনায় উহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

১৭১৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬২৫) জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়ামানবাসী দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আমি সাক্ষাত করিলাম– একজন যু-কালা, অপরজন যু-আম্‌র। তাঁহাদের সহিত আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। তাহা শ্রবণে যু-আম্‌র আমাকে বলিলেন, আপনার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা যদি প্রকৃতই ঐরূপ হইয়া থাকে যাহা আপনি বর্ণনা করিয়াছেন, তবে ইতিমধ্যে তিন দিন পূর্বে তিনি পূর্বে ইহকাল ত্যাগ করিয়াছেন।

অতপর তাঁহারা উভয়ে আমার সঙ্গে মদীনা পানে যাত্রা করিলেন। আমরা তিন জন পথ চলিতে লাগিলাম। পথে একদল লোকের সহিত সাক্ষাত হইল– তাহারা মদীনা হইতে আসিয়াছে। তাহাদের নিকট মদীনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেই তাহারা বলিল, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইহকাল ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) তাঁহার খলীফা মনোনীত হইয়াছেন, জনগণ সুশৃঙ্খল রহিয়াছে। এতদশ্রবণে তাঁহারা উভয় আমাকে বলিলেন, এখন আমরা মদীনায় যাইতেছি না। আপনি আমাদের সম্পর্কে আবু বকর (রাঃ)-কে বলিবেন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, মদীনার পানে যাত্রা করিয়াছিলাম (আশা ছিল নবীজী (সঃ)-এর পদধূলি লাভ হইবে, কিন্তু ভাগ্যে তাহা জুটিবার নহে। হয়ত অচিরেই আমরা ইন্‌শাআল্লাহ তাআলা মদীনায় আসিতেছি। এই বলিয়া তাঁহারা ইয়ামানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আমি মদীনায় পৌঁছিয়া তাঁহাদের সমুদয় কথাবার্তা আবু বকর (রাঃ)-কে জ্ঞাত করিলাম, তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশে বলিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে নিয়া আসিলেন না কেন?

অনেক দিন পর যু-আমরের সহিত আমার পুনঃ সাক্ষাত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, আমার প্রতি আপনার মস্ত বড় অনুগ্রহ রহিয়াছে (আপনার মাধ্যমেই আমি ইসলাম লাভ করিতে পারিয়াছি)। তাই আপনাকে একটি সুসংবাদ শুনাই– আপনাদের (আরব জাতির যাঁহারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন–) যে যাবত এই রীতি বহাল থাকিবে যে, শাসনকর্তা একজনের পর অপরজনের নিয়োগ পরামর্শের মাধ্যমে হইবে তাবত আপনাদের মধ্যে মঙ্গল অক্ষুণ্ন থাকিবে। যখন তরবারির সাহায্যে ক্ষমতা দখল করা হইবে, তখন শাসনকর্তাগণ একনায়ক হইবেন; তাহাদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি একনায়কগণের ন্যায় নিজ মর্জির ভিত্তিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ ইয়ামানের আলোচ্য ব্যক্তিদ্বয় এলাকার সমাজপতি ছিলেন। ইয়ামানবাসী জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ছাহাবী মারফত উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট নবীজী (সঃ) ইসলামের আহ্বান লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই লিপিবাহকরূপেই জরীর (রাঃ) তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মদীনার পানে যাত্রা করিলেন, পথে থাকাকালীনই নবীজী (সঃ) ইহকাল ত্যাগ করেন। তাই তাঁহারা ছাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

আলোচ্য ঘটনায় যে, যু-আম্‌র নামীয় ব্যক্তি মদীনা হইতে বহু দূর ইয়ামানে থাকিয়া আলোচনার মাধ্যমে সর্বশষ পয়গম্বরকে ঠাহর করিতে পারিলেন এবং ইহাও বলিতে পারিলেন যে, তিন দিন পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে– ইহা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব হইয়াছিল।

নবীজী (সঃ)-কে ইহজগত ত্যাগের সঙ্কেতদান

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۔ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۔

নবীজী (সঃ)-এর প্রতি সূরা নসর অবতীর্ণ হইল, যাহা সুসংবাদ বহনকারী ছিল–

অর্থ ঃ আল্লাহর সাহায্য পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে, মক্কা জয় হইয়া গিয়াছে এবং দলে দলে লোকদের আল্লাহর দ্বীনে দীক্ষা আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া নিয়াছেন। অতএব (এখন) স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণার ও তাঁহার প্রশংসায় লিপ্ত থাকুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকুন; নিশ্চয় তিনি হইলেন অতিশয় ক্ষমাশীল, নেক দৃষ্টি দানকারী।

এতদ্ভিন্ন দশম হিজরী সনেই হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জ সমাপন করেন এবং আরাফার ময়দানে সুসংবাদ বহনকারী এই আয়াত নাযিল হয়–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ (ইসলামের অবশিষ্ট রোকন– হজ্জকে স্বয়ং আপনার দ্বারা এবং আপনার সম্মুখে লক্ষাধিক সংখ্যক মুসলমান দ্বারা বিনা বাধায় পূর্ণ শান-শওকতের সহিত সম্পন্ন করাইয়া) আজিকার দিনে আমি তোমাদের (মুসলমান) জন্য তোমাদের দ্বীন (ইসলাম)-কে (আরকান আহকাম এবং শক্তি বিকাশের দিক দিয়া) সম্পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিলাম এবং (এইরূপে) আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকেই দ্বীনরূপে পছন্দ করিয়া নিয়াছি। (পারা–৬, রুকু–৫)

সূরা নসর এবং উক্ত আয়াত বস্তুত হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে ইহজগত ত্যাগ সম্পর্কে একটি সঙ্কেত ছিল। কারণ, ইহজগতে হযরতের আবির্ভাব দ্বীন ইসলাম প্রচারের জন্যই ছিল। তাহা যখন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং এই পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, চতুর্দিক হইতে দলে দলে লোক স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষা নিতেছে, এমতাবস্থায় এই কষ্ট ক্লিষ্টের জগতে অবস্থানের আবশ্যক হযরতের জন্য থাকে নাই, তাই তাঁহাকে ইহজগত ত্যাগের প্রস্তুতি করা চাই। যেমন রাজদূত তাঁহার কার্য শেষে আপন দেশে যথাশীঘ্র ফিরিয়া যাইতে হয়। নবীজী (সঃ)ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার কাজ যখন ফুরাইয়াছে তখন শীঘ্রই তাঁহাকে এই ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

সূরা নসরের এই তাৎপর্য হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) অনুধাবন করিতে পারিয়াই এই সূরার শেষ অংশের আদেশগুলি পালনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। উঠা-বসা, চলাফেরা তাঁহার মুখে শুনা যাইত–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

এবং سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

বিশিষ্ট ছাহাবীগণও ঐ তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩১৯১)

১৭১৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৭৪৩) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফাতুল মুসলেমীন) ওমর (রাঃ) তাঁহার দরবারে (বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে, এমনকি) বদরের জেহাদে অংশগ্রহণকারী বড় বড় ছাহাবীদের সঙ্গে আমাকে স্থান দিয়া থাকিতেন। ইহাতে কোন কোন লোক মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁহারা বলিলেন, এই অল্প বয়স্ক যুবককে কেন আমাদের সঙ্গে স্থান দিয়া থাকেন? তাহার বয়সের সন্তান-সন্ততি আমাদের রহিয়াছে। ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, সে যে কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা ত আপনারা ও জ্ঞাত আছেন।

অতপর একদা ওমর (রাঃ) বিশেষভাবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে দরবারে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে অন্যদের সঙ্গে বসাইলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলম যে, ওমর (রাঃ) (আমার দ্বারা) দরবারের লোকগণকে কোন একটা কিছু দেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

ওমর (রাঃ) দরবারের সকলকে বলিলেন, "ইযা জাআ' নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু" সূরার তাৎপর্য সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চুপ রহিলেন। আর কেহ কেহ বলিলেন, আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্য এবং মক্কা বিজয় হওয়ায় (শুকরিয়াস্বরূপ) আমাদিগকে আল্লাহর প্রশংসা করিতে এবং তাঁহার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থীরূপে নম্র হইয়া থাকিতে আদেশ করা হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবনে আব্বাস ! তুমিও কি এইরূপই বুঝিয়া থাক? আমি বলিলাম, না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে তুমি কি বল? আমি বলিলাম, এই সূরায় হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ইহজগত ত্যাগের কথা জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে আল্লাহর সাহায্যে মক্কা পর্যন্ত জয় হইয়া গিয়াছে এবং চতুর্দিকের লোকজন দলে দলে ইসলামে দীক্ষা লাভ করিতেছে; ইহা আপনার ইহজগত ত্যাগ নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন। অতএব এখন বিশেষভাবে "তসবীহ্ তাহ্মীদ" প্রভুর পবিত্রতা প্রশংসা জপনায় এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত থাকুন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমিও এই সূরার তাৎপর্য তাহাই বুঝি যাহা তুমি বলিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা "নসর" কাহারও মতে বিদায় হজ্জের মধ্যে এবং কাহারও মতে বিদায় হজ্জের পূর্বে নাযিল হইয়াছিল। হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জের পূর্বেই ইহজগত ত্যাগ আসন্ন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বের বৎসরগুলিতে রমযান মাসে জিব্রাঈল ফেরেশতা হযরতের সঙ্গে কোরআন শরীফ একবার খতম করিতেন, দশম হিজরীর রমযান মাসে দুই বার খতম করিলেন। হযরত (সঃ) ইহা দ্বারাও আঁচ করিতে পারিলেন যে, এই রমযান তাঁহার জীবনের শেষ রমযান। সম্মুখে ১৭৩৩ হাদীছে এই তথ্য স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বোধহয় সেই জন্যই তিনি এই রমযানে দশ দিনের স্থলে কুড়ি দিনের এ'তেকাফ করিয়াছিলেন

১৭২০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৭৪৮) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জিব্রাঈল ফেরেশতা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে প্রতি রমযানে একবার কোরআন শরীফ দাওর করিতেন। যেই বৎসর (রমযানের পরে) হযরত (সঃ) ইহজগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সেই বৎসর (রমযানে) দুই বার দাওর করিয়াছিলেন এবং হযরত (সঃ) প্রতি বৎসর দশ দিনের এতেকাফ করিয়া থাকিতেন। যেই বৎসর তিনি ইহজগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সেই বৎসর বিশ দিন এ'তেকাফ করিয়াছিলেন।

মুসলিম শরীফে আছে– হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জে বলিয়াছেন, আমাকে দেখিয়া তোমরা হজ্জের নিয়মাবলী শিখিয়া রাখ; হয়ত তোমাদের সঙ্গে হজ্জ করার সুযোগ পুনরায় আর আমি পাইব না।

বিদায় সঙ্কেত প্রাপ্তিতে নবীজী (সঃ)-এর অবস্থা

স্বদেশে স্বজনগণের নিকটে ফিরিয়া যাওয়ার সময় উপস্থিত হইলে প্রবাসী যেমন তাড়াতাড়ি করিয়া প্রবাসের সমস্ত কাজকর্ম ও ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া, দায়িত্ব কর্তব্য শেষ করিয়া আনন্দ ঔৎসুক্যের সহিত নিজের যাত্রার আয়োজন করিতে থাকে, প্রবাসের প্রতি বিমনা হইয়া পড়ে; ইহজগত ত্যাগের সঙ্কেত প্রাপ্তিতে হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর নবীজী (সঃ) যেন তদ্রূপ পৃথিবীর সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সকল কার্যে সকল চিন্তায় ও ভাবধারায় একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ওপার হইতে আগত ব্যক্তি যেমন বেলা শেষে নদীর কূলে দাঁড়াইয়া ওপারের দিকে তাকায়; নবীজী মোস্তফা (সঃ)ও যেন পরপারের আকর্ষণে এই পার হইতে বিমনা হইয়া পরপারের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন। এমনকি তিনি কোন ভাষণ দিলে শ্রোতাদের অনুভূতিতে ও দৃষ্টিতে তাঁহার ঐ ভাব দিবালোকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিত। যেমন এক হাদীছে আছে –

এরবায (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নামায শেষে আমাদের প্রতি মুখ করিয়া উপদেশমূলক বক্তব্য রাখিলেন, যাহা অত্যধিক মর্মস্পর্শী ছিল। সেই বক্তব্য শ্রবণে সকলের চোখই অশ্রু বহাইতে এবং অন্তর কাঁপিতে লাগিল। একজন ছাহাবী ঐ অবস্থায় আরজ করিলেন, ইয়া

রসূলাল্লাহ! আপনার এই ওয়াজ বিদায়কালীন ওয়াজের ন্যায় মনে হয়। অতএব আপনি আমাদেরে শেষ উপদেশ দিয়া যান। নবীজী (সঃ) ঐ ছাহাবীর কথা খণ্ডন না করিয়া উত্তরদানে বলিলেন; তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ–

"সর্বদা আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবে। আর মুরব্বী ও উপরস্থের কথা মানিয়া চলিবে, যদিও সে নিম্নমানের হয়। আমার পরে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা অনেক বিভেদ দেখিতে পাইবে। সে ক্ষেত্রে তোমরা আমার সুন্নত এবং সত্যের ধারক-বাহক আমার খলীফাদের সুন্নতের উপর দৃঢ়পদ থাকিবে, উহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিবে, উহাকে শক্তভাবে দাঁত দ্বারা কামড় দিয়া ধরিয়া রাখিবে। ঐ সুন্নত ছাড়া যত প্রকার গর্হিত তরীকা হইবে, সব হইতে সযত্নে দূরে সরিয়া থাকিবে। ঐরূপ গর্হিত তরিকাকেই "বেদআত" বলা হয় এবং সব রকম বেদআতই ভ্রষ্টতা। (মেশকাত শরীফ ৩০)

বিদায় হজ্জ সমাপনান্তে মদীনার নিকটবর্তী "গাদীরে খোম" নামক স্থানে নবীজী (সঃ) অবস্থান করিয়া তথায়ও ভাষণ দিয়াছিলেন; সেই ভাষণে সুস্পষ্টরূপে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিদায়ের কথা বলিয়াই দিয়াছিলেন।

"গাদীরে খোম"-এর ভাষণ

মক্কা হইতে মদীনার পথে একটি স্থানের নাম হইল "গাদীরে খোম"। হজ্জ সমাপনান্তে মক্কা হইতে মদীনাপানে যাত্রা করিয়া চারি দিন পথ চলার পর যিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখ শনিবার যোহরের নামাযের সময় সকলকে একত্র করিয়া নবী (সঃ) এই স্থানে বিশেষ কারণে একটি ভাষণ দান করিয়াছিলেন।

শিয়া সম্প্রদায় এই ভাষণকে কোরআন হাদীছ, ঈমান-ইসলামের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। তাহারা ইহাকে তাহাদের হৈ-হল্লা ও গোমরাহ মতবাদের মূল বেসাতি বানাইয়াছে।

ভাষণের মূল কারণ ঃ বিদায় হজ্জে মদীনা হইতে যাত্রার পূর্বেই নবী (সঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অধীনে ইয়ামান এলাকায় একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। আলী (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ তথা হইতে আসিয়া হজ্জ সমাপনে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে শামিল হইয়াছিলেন। হজ্জ সমাপনান্তে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে এই "গাদীরে খোম" নামক স্থানে বা ইহার পূর্বে ঐ বাহিনীর লোকগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আলী (রাঃ) সম্পর্কে কোন বিষয়ে অভিযোগ করিলেন। বিশেষতঃ বোরায়দা (রাঃ) নামক ছাহাবী যিনি আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আচরণকে অশোভনীয় গণ্য করিয়াছিলেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট তাঁহার সম্পর্কে অভিযোগ করিলেন। তাহাতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছিল।

এস্থলে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য– একটি সর্বক্ষেত্রের জন্য নীতিগত বিষয়, আর একটি এই ক্ষেত্রের বিশেষ বিষয়।

নীতিগত বিষয়টি হইল, নবী (সঃ) আল্লাহ তাআলার এই পরিমাণ প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, প্রভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহলে বায়ত– পরিবার-পরিজন আল্লাহ তাআলার বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। যেরূপ মালে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পঞ্চমাংশ, যাহা সকল মুসলমানের সাহায্যার্থ বায়তুল মাল বা জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে জমা করা হইত, তাহার মধ্যে "জবিল কোরবা" তথা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়বর্গের জন্য একভাগ বিধানগতরূপে নির্ধারিত থাকিত। ইসলামের এই বিধান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বজনপ্রীতি ছিল না। "নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা"। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি স্বজনপ্রীতির এক অণুকণার ধারণাও ঈমান ধ্বংসকারী। উল্লিখিত বিধান ত পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত রহিয়াছে (পারা–১০, রুকু– ১ দ্রষ্টব্য)। এই বিধান আল্লাহই করিয়া দিয়াছেন। তদ্রূপই

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাআলার অতুলনীয় ভালবাসার প্রভাবে তাঁহার আহ্‌লে বায়ত আল্লাহ তাআলার বিশেষ প্রীতিভাজন সাব্যস্ত। এই প্রীতিভাজন হওয়ার স্বাভাবিক ফল ইহাই যে, তাঁহাদের প্রতি সকলেই বিশেষ ভালবাসা রাখিতে হইবে; তাঁহাদের সম্পর্কে প্রশস্ত অন্তর রাখিতে হইবে এবং ইহার বিপরীত কাজ মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গল হইবে। নবী (সঃ) উম্মতের জন্য নীতি নির্ধারক ও মঙ্গলকামী হিসাবে উল্লিখিত সত্য সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করা তাঁহার একটি কর্তব্য ছিল। গাদীরে খোমের ঘটনা ঐ সত্যটি আলোচনার একটি সুন্দর ও উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। কারণ, ঐ ঘটনায় নবী (সঃ)-এর আহ্‌লে বায়তের অন্যতম সদস্য আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি সঙ্কীর্ণমনা হওয়ার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। সামান্য ছোটখাট বিষয়ে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি অভিযোগ করা হইয়াছিল।

আর ঐ ক্ষেত্রে অনুধাবনের বিশেষ বিষয় এই ছিল যে, ঐ অভিযোগের ব্যাপারে আলী (রাঃ) নির্দোষ ছিলেন। আলী (রাঃ) আহ্‌লে বায়তের সদস্য হিসাবে তিনি বিশেষ প্রীতিভাজন হওয়ার অধিকারী। এমতাবস্থায় নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি অভিযোগ তাঁহার অধিকার বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি ভালবাসা রাখার বিশেষ নির্দেশ ও দাবী নিতান্তই প্রয়োজনীয়। সেই প্রয়োজনের তাকিদেই নবী (সঃ) "গাদীরে খোম" স্থানে এই বিষয়ে বিশেষ ভাষণ দান করিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৫-২০৮)

মুসলিম শরীফের হাদীছে উক্ত ভাষণের উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা বর্ণনার পর নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন-

اَلاَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ رَسُوْلُ رَبِّىْ فَاُجِيْبَ وَاَنَا تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهٖ وَاَهْلُ بَيْتِىْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ ـ

অথ ঃ হে লোকসকল! আমি মানুষই বটে; অচিরেই হয়ত আমার প্রভুর দূত আমাকে নিয়া যাওয়ার জন্য উপস্থিত হইবেন; আমিও অবিলম্বে তাঁহার ডাকে সাড়া দিব। আমি অতি মহান দুইটি জিনিস তোমাদের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছি। প্রথমটি হইল, আল্লাহর কিতাব, যাহার মধ্যে হেদায়াত (সঠিক পথ প্রদর্শন) এবং নূর (ঐ পথের আলো) রহিয়াছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে ধরিয়া থাকিবে, উহা আঁকড়াইয়া থাকিবে। দ্বিতীয়টি হইল আমার পরিবার-পরিজন (তাহাদের হইতে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করিবে)। তাহাদের সম্পর্কে তোমাদিগকে আল্লাহর ভয় স্মরণ করাইয়া যাইতেছি। (আসাহ, ৫৩৯)

নাসায়ী শরীফ এবং অন্যান্য কিতাবে উক্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ এইরূপ রহিয়াছে- "গাদীরে খোম" এলাকায় পৌঁছিয়া যোহর নামাযের সময় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের জন্য গাছতলায় স্থান ঠিক করা হইল এবং লোকদিগকে নামাযের জন্য একত্র করা হইল; যোহরের নামায একটু সত্বরই পড়া হইল। নামাযান্তে রসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কে ডাকিয়া নিজের ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন! তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআলার গুণ-গান পূর্বক বলিলেন-

اَيُّهَا النَّاسُ كَاَنِّىْ قَدْ دُعِيْتُ فَاَجَبْتُ اِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ اَهْلَ بَيْتِىْ فَانْظُرُوْا كَيْفَ تَخْلُفُوْنِّىْ فِيْهِمَا فَاِنَّهُمَا لَنْ يَّتَفَرَّقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ مَوْلَاىَ وَاَنَا وَلِىُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِ عَلِىٍّ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَاَحِبَّ مَنْ اَحَبَّهٗ وَاَبْغِضْ مَنْ اَبْغَضَهٗ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهٗ ـ

অর্থ ঃ "হে লোকসকল! আমার যেন (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে পরপারের) ডাক আসিয়া গিয়াছে এবং আমি তাহা গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। আমি অতি মহান দুইটি বস্তু তোমাদের নিকট রাখিয়া যাইতেছি– আল্লাহর কিতাব এবং আমার পরিবার পরিজন, আমার আহলে বায়ত। আমার পরে এই দুই বস্তু সম্পর্কে নীতি অবলম্বনে তোমরা গভীর চিন্তা করিও। এই বস্তুদ্বয় এক সঙ্গেই হাউজে কাওসারের কিনারায় আমার নিকট উপস্থিত হইবে (তাহাদের সহিত তোমাদের নীতি সম্পর্কে ঐ সময় তাহারা বক্তব্য রাখিবে)।

তার পর নবী (সঃ) বলিলেন– আল্লাহ আমার প্রিয়, আমি সকল মোমেনের প্রিয়; এই কথা বলার পর নবী (সঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হস্ত ধারণপূর্বক বলিলেন, আমি যাহার প্রিয় হইব আলীও তাহার প্রিয় হইতে হইবে। আয় আল্লাহ! তুমি তোমার প্রিয় বানাও ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি আলীকে প্রিয় বানায় এবং তুমি শত্রু গণ্য কর ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি আলীকে শত্রু বানায় এবং তুমি ভালবাস ঐ ব্যক্তিকে যেব্যক্তি আলীকে ভালবাসে এবং অসন্তুষ্ট থাক ঐ ব্যক্তির প্রতি যেব্যক্তি আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে এবং সাহায্য কর ঐ ব্যক্তির যে ব্যক্তি আলীর সাহায্য করে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবার-পরিজন ও "আহ্‌লে বায়ত" ছিলেন মুসলিম জননী নবী পত্নীগণ, আর ফাতেমা (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং হাসান ও হোসাইন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা (বয়ানুল কোরআন; পারা–২২, রুকু–১)

নবী পত্নীগণ আহলে বায়ত হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ইশারা রহিয়াছে; অন্যান্যগণ সম্পর্কে দুইটি হাদীছ আছে। একটি হাদীছে ত নিতান্তই সুস্পষ্ট। কোন এক বিশেষ উপলক্ষে নবী (সঃ) আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ) এবং হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-কে ডাকিয়া একত্রীত করিলেন এবং বলিলেন–اللهم هؤلاء إهلى "হে আল্লাহ! ইহারা আমার আহ্‌ল পরিজন।" (মুসলিম শরীফ)–

অপর হাদীছে আছে– একদা নবী (সঃ) স্বীয় চাদরের ভিতরে হাসান, হোসাইন, ফাতেমা ও আলী (রাঃ)-কে জড়াইয়া নিয়া ২২ পারা প্রথম রুকুর ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিলেন যাহাতে "আহ্‌লে বায়ত" -এর উল্লেখ রহিয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

আলোচ্য ভাষণে আলী (রাঃ) সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তির প্রতিক্রিয়া ছাহাবা কেরামের উপর কি হইয়াছিল সে সম্পর্কে উক্ত ভাষণের পর ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উক্তি এই –

هنيئا يا ابن ابى طالب اصبحت وامسيت مولى لكل مؤمن ومؤمنة -

অর্থ ঃ হে আবু তালেব পুত্র! আপনাকে মোবারকবাদ– আপনি সর্বদার জন্য প্রত্যেক মোমেন নর-নারীর প্রিয়পাত্র হইয়া গেলেন। (মেশকাত শরীফ, ৫৬৫)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মর্তবা ও ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীছই বর্ণিত রহিয়াছে। আলোচ্য ভাষণটি ত আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি ভালবাসা রাখার আদেশ ও দাবী জ্ঞাত করার জন্যই ছিল। কিন্তু মান মর্যাদা, ফযীলত ও ভালবাসার জন্য তাহা অবধারিত নহে যে, আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত– প্রথম খলীফা হওয়ার নির্ধারিত অধিকারী ছিলেন। শিয়া সম্প্রদায় আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্পর্কে সেই অধিকারেরই আকীদা ও একীন রাখিয়া থাকে। এমনকি তাহাদের মৌলিক মতবাদ এই যে, আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই অধিকার খর্ব করিয়া ছাহাবীগণ অন্যায় করিয়াছিলেন (নাউযু বিল্লাহে মিন যালিকা)। এইরূপ মতবাদ ও ধারণা পোষণ করা কবীরা গোনাহ।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত ও তাঁহার পরবর্তী খলীফা আবু বকর (রাঃ) হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনেক সুস্পষ্ট ইশারা বিদ্যমান ছিল। (১) অন্তিম শয্যায় নবী (সঃ) নামাযের জন্য যাইতে অপারগ হইলে পর আবু বকর (রাঃ)-কে ইমাম হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাহার বিপরীতে

কতেক বার পীড়াপীড়ি করার উপর নবী (সঃ) কঠোর মন্তব্যপূর্বক জোরালো ভাষায় আদেশ করেন– مروا بابكر فليصل بالناس "লোকদের নামায পড়াইবার জন্য তোমরা আবু বকরকেই বল।" এই অবস্থায় নবী (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত বিশ ওয়াক্ত নামাযে আবু বকর (রাঃ)-ই ইমাম থাকেন; অথচ সেখানে আলী (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। (২) অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে নবী (সঃ) হজ্জে গমন করেন নাই; তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে তাঁহার স্থলে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আলী (রাঃ)-কে পরে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। (৩) নবী (সঃ) কাহাকেও কোন কথা বা আশ্বাস দিলে তাহা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁহার উপর থাকিবে– এইরূপ প্রশ্নের ক্ষেত্রে নবী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করিয়া দিতেন। (৪) খেলাফত সম্পর্কে লোকদের বিভিন্ন দাবী ও আশার নিরসনে অন্তিম শয্যায় নবী (সঃ) লিপি লিখিয়া দেওয়ার জন্য আবু বকর (রাঃ) এবং তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অতপর তাঁহার সেই ইচ্ছা তিনি মুলতবী করিয়াছেন এই বলিয়া যে يابى الله والمؤمنون الا ابابكر "আল্লাহ এবং মুসলিম সমাজ আবু বকর ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্বীকার করিবে না।" এই সম্পর্কে ৬ষ্ঠ খণ্ডে আবু বকর (রাঃ)-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এই শ্রেণীর অনেক তথ্য হইতে চোখ বন্ধ করিয়া "গাদীরে খোম"-এর ভাষণকে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রথম খলীফা নির্ধারিত হওয়ার প্রমাণরূপে দাঁড় করা ভ্রষ্টতা বৈ নহে। উক্ত ভাষণে খলীফা নির্ধারণের কোন উক্তি নাই; আলী (রাঃ) সম্পর্কে "মাওলা" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহার অর্থ প্রিয়পাত্র; খলীফা হওয়ার অর্থের সঙ্গে ঐ শব্দের কোন সম্পর্ক নাই।

এইভাবে যতই দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ততই পরপারের দিকে দ্রুত আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং ইহজীবন হইতে বিদায়ী কার্যকলাপ ব্যস্ততার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

ওহুদ পর্বতের পাদদেশে ভয়াবহ যুদ্ধ ময়দানে যাঁহারা কঠোর পরীক্ষায় নবীজীর চরণ প্রান্তে দাঁড়াইয়া দ্বীন ইসলামের সেবায় আত্মদান করিয়াছেন– বিদায়ের বেলায় নবীজী (সঃ) তাঁহাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করিলেন। এমনকি (অনেকের মতে) এই সময়ে একদা তিনি ওহুদ প্রান্তে যথায় শহীদাগণ চির নিদ্রায় শুইয়া আছেন তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শহীদানের সমাধি কিনারায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের জন্য প্রাণ ভরিয়া দোয়া করিলেন। ঘটনার বর্ণনাকারী যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন– নবীজী (সঃ) যেন মৃত, জীবিত সকল হইতে বিদায় হইতেছিলেন। (পৃঃ ৫৭৮)

নবীজী (সঃ)-এর পীড়ার সূচনা

দশম হিজরীর শেষ যিলহজ্জ মাসে হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জ সমাপন করিয়া মাসের অল্প কয়েক দিন বাকী থাকিতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন– তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। পরবর্তী মহররমের চাঁদ হইতে একাদশ হিজরী বৎসর আরম্ভ হইল। পূর্ণ মহররম মাসও হযরত (সঃ) সুস্থ ছিলেন।

একাদশ হিজরীর দ্বিতীয় মাস– সফর মাসের শেষ দিকে একদা রাত্রি বেলা হযরত নবী (সঃ) স্বীয় খাদেম আবু মোআইহাবাহ্‌কে নিদ্রা হইতে উঠাইলেন এবং বলিলেন, "বাকী (মদীনার) কবরস্থানে যাইয়া তথাকার সমাহিতদের জন্য দোয়ায়ে মাগফেরাত করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। সেমতে হযরত (সঃ) তথায় গেলেন এবং প্রত্যাবর্তন করার পর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন– তাঁহার মাথা ব্যথা ও জ্বর আরম্ভ হইল। এই রাত্রটি ২৯ সফর মঙ্গলবার দিবাগত ৩০ সফর বুধবার রাত্র ছিল।*

---

* অর্থাৎ সফর মাসের মাত্র এক রাত্র বাকী রহিয়াছে। এই সময় হযরত (সঃ) রোগাক্রান্ত হইলেন। এই রাত্রটি বুধবার গণ্য। কারণ ইসলামী হিসাবে রাত উহার পরবর্তী দিনের অংশ বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত "আখেরী চাহার শোম্বা" তথা সফর মাসের শেষ বুধবারের বৈশিষ্ট্যের সূত্র ইহাই যে, এই বুধবারেই হযরতের অন্তিম রোগ হইয়াছিল। রোগাক্রান্তির বরা ত বুধবার ছিল, কিন্তু তাহা কোন তারিখ ছিল সেই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। সফর মাসের শেষ রাত্র হওয়া সম্পর্কেও একটি মত্

রোগের প্রথম প্রকাশ

"জান্নাতুল বাকী" গোরস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবীজী (সঃ) পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে আসিয়া নবীজী (সঃ) শুনিতে পাইলেন– আয়েশা (রাঃ) মাথার ব্যথায় কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছেন– উঃ! মাথা গেল! তখন নবীজী (সঃ) বিবি আয়েশার সহিত কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার ত্রাসের কি কারণ? আমার সম্মুখে তোমার মৃত্যু হইলে ত তোমার বড় সৌভাগ্য। আমার হাতে তোমার কাফন দাফন ইত্যাদি সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হইবে এবং আমি তোমার জানাযা পড়াইয়া কবরে শোয়াইয়া দিব– এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে! আয়েশা (রাঃ) তদুত্তরে রাগত স্বরে ঠেস মারিয়া বলিলেন, মনে হয় আপনার কামনা– আমি মরিয়া যাই আর আপনি একজন নতুন বিবি আনিয়া আমার ঘরে নতুন সংসার পাতেন! এই সময় নবী (সঃ) বিবি আয়েশার এই স্নিগ্ধ বিদ্রূপ স্মিত হাস্যে উপভোগ করিয়া নিজের অসুস্থতার কথা প্রকাশপূর্বক বলিলেন, তোমার মাথা কি গেল? বরং আমার মাথা গেল! (বেদায়া, ৪–২২)

নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যের উল্লেখ আছে।

১৭২১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৪৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মাথা ব্যথায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলাম, হায় মাথা! আমার হায়-হুতাশ শুনিয়া নবী (সঃ) বলিলেন, তোমার চিন্তা কি? আমি জীবিত থাকাবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হইয়াই যায় তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফেরাত কামনা ও দোয়া করিব।

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হায়! আমার পোড়া কপাল মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু কামনা করেন! তাহা হইলে ত সেই দিনের শেষ ভাগে (আমার গৃহে) অন্য স্ত্রীর সঙ্গে আপনি রাত্রি যাপন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মৃদু হাসি হাসিলেন এবং) বলিলেন, (তোমার মাথায় কি ব্যথা? তাহাতে কিছুই নহে, বরং আমার মাথায় সাংঘাতিক ব্যথা; আমি বলিতে পারি– হায় মাথা! (ইহা হইতেই হযরতের অন্তিম রোগ আরম্ভ।)*

নবীজী (সঃ)-এর অন্তিম রোগ

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিম রোগের আরম্ভ ছিল মাথা ব্যথা; অচিরেই ইহার সহিত ভীষণ জ্বরও মিলিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলাম; তখন নবীজী ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। আমি তাঁহার গায়ে হাত রাখিয়া বলিলাম, আপনার জ্বর ত অতি মাত্রায়! নবীজী (সঃ) বলিলেন, হাঁ– তোমাদের সাধারণ লোকের দুই জনের সমপরিমাণ জ্বর আমার আসে। আমি আরজ করিলাম, ইহা কি এই কারণে যে, আপনার সওয়াবও দ্বিগুণ? নবী (সঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি শপথ করিয়া আরও বলিলেন, যেকোন মুসলমানের পীড়া বা অন্য কোন কষ্ট হইলে তাহার গোনাহ এইরূপে ঝরিয়া যায় যেরূপ গাছের শুষ্ক পাতা ঝরিয়া যায়। (বেদায়া, ৪–৪৩৭)

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ঐ সময়) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গায়ে কম্বল দেওয়া ছিল। জ্বর এরূপ ভীষণ ছিল যে, ঐ কম্বলের উপর হাত রাখিলে জ্বরের তাপ অনুভূত হইত। (যোরকানী, ৮–২০৯)

আছে, (মজমুয়া ফতওয়া মালানা আবদুল হাই, ২–২৩৯ দ্রষ্টব্য।) আমরা এই মতকে অগ্রগণ্য ধরিয়াছি। কারণ, এই বুধবার ৩০ তারিখ হইলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দিন সোমবার রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ হইতে পারে, যাহা অতি প্রসিদ্ধ। এই সম্পর্কে একটি জটিল প্রশ্ন আছে, তাহার মীমাংসা "শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দিন" বর্ণনাস্থলে উল্লেখ করা হইবে।

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়গুলি মেশকাত শরীফ ৫৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

নবীজী (সঃ)-এর শেষ অবস্থান

রোগ অবস্থায়ও নবীজী (সঃ) তাঁহার ন্যায় নীতি আদর্শের উপর দৃঢ় ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি বিবিগণের জন্য নির্ধারিত তারিখে এক এক বিবির গৃহে অবস্থান করিয়া যাইতেছিলেন। অবশেষে যখন পীড়ার যাতনা বাড়িয়া গেল এবং এই ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়ার ক্ষমতা ঘনাইয়া আসিল, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ জন্মিল। এই গৃহই সর্বাধিক ওহী অবতরণের ক্ষেত্র এবং বিধাতা কর্তৃক তাঁহার শেষ শয্যার স্থানরূপে নির্ধারিত ছিল। এই গৃহে আসিবার দিন ছিল সোমবার দিন; সোমবার দিনের পূর্ব হইতেই নবীজী (সঃ) এই গৃহের প্রতি স্বীয় আকর্ষণ ও অপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যের বিবরণ রহিয়াছে।

১৭২২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪০) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতেন, আগামীকল্য আমি কোন্ স্ত্রীর গৃহে থাকিব? এই জিজ্ঞাসা দ্বারা তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে থাকিবার দিনের প্রতি অপেক্ষা প্রকাশ করিতেছিলেন। অন্য বিবিগণ (ইহা বুঝিতে পাইয়া) সন্তুষ্ট চিত্তে নবী (সঃ)-কে যাহার গৃহে ইচ্ছা অবস্থান করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সেমতে হযরত (সঃ) আয়েশার গৃহে অবস্থান করিলেন, এমনকি এই গৃহেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ সোমবার দিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে অবস্থানের দিন; এই দিন হযরত (সঃ) আয়েশার গৃহে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অসুস্থ অবস্থায় এই গৃহেই পরবর্তী সোমবারে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই সময় একদা হযরত (সঃ) বলিলেন, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, আবু বকর ও তাহার পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া (আবু বকরকে আমার স্থলাভিষিক্তরূপে) মনোনীত করিয়া দেই, যেন অন্য কাহারও কিছু বলার বা আশা করার অবকাশ না থাকে, কিন্তু পরে ভাবিলাম, (আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মনোনয়ন) একমাত্র আবু বকর ছাড়া অন্য কাহারও জন্য আল্লাহ তাআলাও হইতে দিবেন না, মুসলমানগণ গ্রহণ করিবে না।

পরকালীন জেন্দেগীকে প্রাধান্য দান

নবীগণের কর্তব্য পূর্ণ হওয়ার পর তাঁহাদের সম্মানার্থ মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাঁহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইত যে, ইচ্ছা করিলে দুনিয়ার দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে পারেন অথবা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রস্তুত নেয়ামতসমূহ উপভোগেও চলিয়া আসিতে পারেন।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকেও সেই অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। হযরত (সঃ) আখেরাতকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। রোগ শয্যায় শায়িত হওয়ার কয়েক দিন পর স্বয়ং হযরত (সঃ) এই বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকাশও করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭২৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫১৬) আবু সায়ী'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সর্ব সাধারণ সমক্ষে ভাষণ দান করিলেন তিনি বলিলেন। আল্লাহ তাআলা এক বান্দাকে দুনিয়ার জেন্দেগী উপভোগ কিম্বা তাঁহার নিকট সুরক্ষিত নেয়ামত উপভোগ– উভয়ের কোন একটা গ্রহণ করার এখতিয়ার দিয়াছেন; সে আল্লাহর নিকট সুরক্ষিত নেয়ামত উপভোগকেই অবলম্বন করিয়াছে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, এতদশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমাদের মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ হউক! আমরা তাঁহার ক্রন্দনে আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক বান্দা সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশ করিলেন আর এই বৃদ্ধ কাঁদিতেছেন! প্রকৃত প্রস্তাবে সেই

বান্দা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ)-ই ছিলেন (আমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম না, আবু বকর (রাঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন)। আবু বকর (রাঃ) আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।

(আবু বকরের ক্রন্দন হযরত (সঃ)-কে বিশেষরূপে অভিভূত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, তাই) হযরত (সঃ) তাঁহাকে ক্রন্দন হইতে বারণ করিতেছিলেন এবং) বলিলেন, জান-মাল উভয় দ্বারা আমার প্রতি সর্বাধিক উপকারী ব্যক্তি হইল আবু বকর (রাঃ)। আমি যদি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ব্যতীত অন্য কাহাকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম তবে আবু বকর (রাঃ)-কে নিশ্চয়ই সেই স্থান দান করিতাম। অবশ্য তাহার জন্য ইসলামীভ্রাতৃত্ব সেই সূত্রের দোস্তি মহব্বত পূর্ণরূপে রহিয়াছে।

হযরত (সঃ) (আবু বকরের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনস্বরূপ) এই নির্দেশও দান করিলেন যে, নিজ নিজ বাড়ী হইতে (আমার) মসজিদের দেয়ালে যতগুলি দরজা খোলা হইয়াছে তন্মধ্যে শুধু আবু বকরের দরজা বাকী রাখিয়া অন্যান্য সমুদয় দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চারি দিন পূর্বে

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন বুধবার এবং দীর্ঘ তের দিন* রোগ শয্যায় থাকিয়া সোমবার দিন ইহাজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন– সেই সোমবারের পূর্বের বৃহস্পতিবার দিন হইতে রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমতাবস্থায় দিনের প্রথমার্ধে হযরত (সঃ) মুসলমানদের মঙ্গলার্থ একটি লিপি লিখিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া কাগজ-কলম চাহিলেন। কিন্তু হযরত (সঃ) রোগ যাতনার ভীষণ চাপে থাকিয়া আবার লিপি লেখাইবার কষ্ট করিবেন তাহা কোন কোন ছাহাবীর পক্ষে অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা কাগজ কলম আনিয়া দিয়া হযরতের কষ্ট-ক্লেশ বর্ধিত করিতে বাধা দান করিলেন। অবশেষে হযরত (সঃ)-ও স্বীয় ইচ্ছা হইতে বিরত রহিলেন এবং মতভেদ করিতে যাইয়া সাহাবীগণের মধ্যে কিছুটা গণ্ডগোল সৃষ্টি হইলে হযরত (সঃ) সকলকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ঘটনার বিবরণ ১ম খণ্ডে ৯০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত ঘটনার পর যোহরের নামাযের ওয়াক্তে হযরত (সঃ) বিশেষ কায়দায় গোসল করতঃ ব্যথার দরুন মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদে তশরীফ আনিলেন এবং নামাযান্তে একটি ভাষণ দান করিলেন– ইহাই ছিল তাঁহার কর্মময় জীবনের সর্বশেষ ভাষণ। (সীরাতে মোস্তফা, ৭–১৯৭)

১৭২৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগ শয্যায় আমার গৃহে আসিবার পর তাঁহার রোগ যাতনা বৃদ্ধি পাইলে পর তিনি বলিলেন, সাত মশক পানি, যাহার মুখ বন্ধই রহিয়াছে, এখনও খোলা হয় নাই– আমার উপর ঢালিয়া (গোসল করাইয়া) দাও। লোকদিগকে একটি বিশেষ কথা জানাইতে চাহিতেছি– সেই কার্যে যেন আমি সক্ষম হই।

সেমতে আমরা হযরত (সঃ)-কে একটি বড় টবের মধ্যে বসাইলাম এবং তাঁহার গায়ে ঐরূপ মশকের পানি ঢালিতে লাগিলাম। হযরত (সঃ) যখন বলিলেন, তোমরা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ, তখনই আমরা ক্ষান্ত হইলাম। অতপর হযরত (সঃ) আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এই দুই জনের কাঁধে ভর করতঃ (ঘর হইতে) বাহির হইয়া (মজিদে) লোকদের সম্মুখে আসিলেন এবং নামায পড়াইয়া ভাষণ দিলেন। (এই ভাষণের উল্লেখ প্রথম খণ্ড ৬৯১ নং হাদীছে আছে।)

এই ভাষেণেই হযরত (সঃ) স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করণার্থ ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহুদী-নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক; তাহারা তাহাদের নবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদা করিয়া থাকিত।

১৭২৫। হাদছি ঃ (পৃঃ ৬৩৯) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَاكَ لَاُبْرِزَ قَبْرُهُ خَشِىَ اَنْ يُّتَّخَذَ مَسْجِداً

* এইসব নির্ধারণ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে।

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অন্তিম শয্যায়, যেই রোগ শয্যা হইতে আর সারিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই অবস্থায় বলিয়াছিলেন, (আল্লাহ ধ্বংস করুন *) আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক ইহুদী-নাসরাদের উপর; তাহারা তাহাদের নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল (নবীগণের কবরকে সেজদা করিত)।

আয়েশা (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি এইরূপ গর্হিত কার্যের রীতি পূর্ব হইতে না থাকিত তবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কবর শরীফ উন্মুক্ত রাখা হইত কিন্তু এস্থলেও আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, ইহাকেও সেজদার স্থান বানান হয় না কি! (তাই গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীছটি অতি প্রয়োজনীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। হাদীছখানা ইমাম বোখারী (রঃ) মূল গ্রন্থে পাঁচ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)ও এই বিষয়টি সম্পর্কে সতর্কীকরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন, এমনকি ইহা তিনি তাঁহার কর্মময় জীবনের সর্বশেষ ভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন, বরং ইহার উপরও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তে যখন স্বীয় পবিত্র আত্মাকে সৃষ্টিকর্তার হাওয়ালা করিয়াছিলেন তখনও পুনঃ পুনঃ এই সতর্ক বাণীই উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম খণ্ড ২৭৮ হাদীছ দ্রষ্টব্য।

বক্ষ্যমাণ হাদীছখানা মুসলিম শরীফে অতিরিক্ত একটি শব্দের সহিত বর্ণিত আছে, যাহা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত (সঃ) সর্বশেষ এই ভাষণে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন–

الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياءهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انى انهاكم عن ذالك ـ

অর্থ ঃ "তোমরা সতর্ক থাকিও! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের নবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়া থাকিত। খবরদার! তোমরা কখনও কোন কবরকে সেজদার স্থান বানাইও না। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ঐরূপ কার্য হইতে নিষেধ করিতেছি।"

উক্ত ভাষণে হযরত (সঃ) মদীনাবাসী ছাহাবী আনসারগণ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিও উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছদ্বয়ে রহিয়াছে।

১৭২৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৩৬) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিম শয্যায়) একদা আবু বকর (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ) আনসারদের এক মজলিসের নিকটবর্তী পথে যাইতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আনসারগণ তথায় বসিয়া কাঁদিতেছেন।

আবু বকর ও আব্বাস (রাঃ) তাঁহাদিগকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আনসারগণ বলিলেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারের কথা স্মরণে কাঁদিতেছি। আবু বকর ও আব্বাস (রাঃ) এই সংবাদ নবী (সঃ)-কে জানাইলেন।

আনাছ (রাঃ) বলেন, অতপর নবী (সঃ) (রুগ্ন অবস্থায় অসহনীয় ব্যথার দরুন) মাথায় কাপড় পট্টি বাঁধিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং মসজিদে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হইলেন। মিম্বরের উপর ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ আরোহণ। অতপর আর তিনি মিম্বরে আরোহণ করিতে পারেন নাই। মিম্বরে বসিয়া পূর্ণাঙ্গী ভাষণ দানার্থ প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিলেন, অতপর আনসারদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন–

أُوْصِيْكُمْ بِالْاَنْصَارِ فَاِنَّهُمْ كَرِشِيْ وَعَيْبَتِيْ وَقَدْ قَضَوُا الَّذِيْ عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِيْ لَهُمْ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ ـ

---

* বোখারী শরীফ ৬২ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে এই শব্দ রহিয়াছে।

অর্থ ঃ "হে লোকসকল! আমি তোমাদিগকে আনসার- মদীনাবাসী ছাহাবীগণের পক্ষে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি; তাঁহারা আমার ভিতর-বাহিরের বন্ধু। তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য (যে সম্পর্কে আ'কাবা সম্মেলনে ওয়াদা করিয়াছিলেন) পূর্ণ মাত্রায় আদায় করিয়াছেন। তাঁহাদের তোমাদের নিকট সেই প্রাপ্য-বাকী রাহিয়াছে। অতএব তাঁহাদের সুব্যবহার বিশেষ আদর-কদরের সহিত গ্রহণ করিও এবং অরুচির ব্যবহার দেখিলে তাহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া যাইও।

১৭২৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ২২৭) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (অন্তিম শয্যায়) একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করিলেন। একখানা চাদর তাঁহার গায়ে উভয় স্কন্ধ সমেত জড়ান ছিল এবং মাথায় তৈলে তৈলাক্ত একখানা রুমাল, যাহা তিনি পাগড়ীর নীচে ব্যবহার করিয়া থাকিতেন, তাহা দ্বারা মাথায় পট্টি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ইহাই ছিল মিম্বরের উপর তাঁহার সর্বশেষ আরোহণ।

হযরত (সঃ) মিম্বরে উপবিষ্ট হইয়া আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! আমার নিকটে আসিয়া যাও। সেমতে সকলেই তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিলেন। অতপর হযরত (সঃ) বলিলেন-

فَاِنَّ هٰذَا الْحَىَّ مِنَ الْاَنْصَارِ يَقِلُّوْنَ وَيَكْثُرُ النَّاسَ فَمَنْ وَلِىَ شَيْئًا مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَاسْتَطَاعَ اَنْ يَّضُرَّ فِيْهِ اَحَدًا اَوْ يَنْفَعَ فِيْهِ اَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

অর্থ ঃ "আনসারগণের" বংশধর ধীরে ধীরে সংখ্যালঘুতে পরিণত হইয়া যাইবে, অন্যান্য লোকগণ সংখ্যাগুরু হইয়া দাঁড়াইবে। তোমাদের যে কেহ মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতে কোন ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং লোকদের লাভ-লোকসানে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে, তাহার কর্তব্য হইবে আনসারদের সুব্যবহার আদর-কদরের সহিত গ্রহণ করা এবং তাঁহাদের কোন অরুচির ব্যবহার দেখিতে পাইলে তাহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলা।

এই ভাষণে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও আদেশ করিয়াছেন-

১৭২৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪২৯) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মৃত্যুকালে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন।

(১) সমস্ত মোশরেক- পৌত্তলিকদেরকে আরব উপদ্বীপের সীমানা হইতে বাহির করিয়া দিবে।

(২) বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে ঐরূপে উপহার দিবে যেরূপ আমি দিয়া থাকিতাম।

(৩) পবিত্র কোরআন বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাকারী ভুলিয়া গিয়াছেন।

রোগ শয্যায় শায়িত হইয়াও হযরত (সঃ) প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে মসজিদে তশরীফ আনিতেন এবং ইমামতিও করিতেন। বৃহস্পতিবার রোগ আক্রমণ বৃদ্ধি পাইবার পর এই দিনের মাগরিবের নামাযই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক ইমামতির সর্বশেষ নামায। সূরা "ওয়াল-মোরসালাত" দ্বারা তিনি এই নামায পড়াইয়াছিলেন। ১ম খণ্ডে ৪৪৪ নং হাদীছে এই তথ্যটি বর্ণিত হইয়াছে।

এই দিনে মাগরিবের নামাযের পর হযরতের রোগ-যাতনা চরমে পৌঁছিয়া গেল। এমতাবস্থায় এশার নামাযের ওয়াক্ত হইল। হযরত (সঃ) বার বার ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেন নামাযের জন্য মসজিদে যাইবার, কিন্তু যত বারই তিনি শয্যা হইতে উঠিতে উদ্যত হইলেন প্রতিবারই মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। অবশেষে আবু বকর (রাঃ)-কে ইমাম হইয়া নামায পড়াইবার আদেশ করিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-১৯৯)

১৭২৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (বৃহস্পতিবার এশার সময়ে) তাঁহার রোগ যাতনা বৃদ্ধি অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন اصلى الناس "লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, لا يارسول الله وهم ينتظرونك না- হুজুর! তাহারা এখনও নামায পড়ে নাই; আপনার উপস্থিতির অপেক্ষা করিতেছে।" তখন হযরত (সঃ) বলিলেন- ضعوا لى ماء فى المخضب "আমার জন্য টবের মধ্যে পানি ঢাল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাহাই করা হইল এবং হযরত (সঃ) ঐ পানিতে গোসল করিলেন। অতপর হযরত (সঃ) উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না- মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। তারপর চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? সকলেই উত্তর করিল, না-- হুযুর! তাহারা আপনার উপস্থিতির অপেক্ষায় আছে। হযরত (সঃ) পুনরায় টবের মধ্যে পানি ঢালিতে আদেশ করিলেন এবং উহাতে গোসল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এইবারও মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। এইবারও হযরতের চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে হযরত (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? সকলেই উত্তর করিল, না- হুজুর! তাহারা আপনার অপেক্ষায় আছে। হযরত (সঃ) তৃতীয় বার টবের মধ্যে পানি ঢালিবার আদেশ করিলেন এবং গোসল করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এইবারও মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। লোকজন তখনও এশার নামাযের জন্য হযরতের অপেক্ষায় মসজিদে সমবেত হইয়া আছে।*

অতপর হযরত (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট (বেলাল (রাঃ) মারফত) সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। সংবাদদানে প্রেরিত লোকটি আবু বকরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

আবু বকর (রাঃ) অতিশয় নরম দিল মানুষ ছিলেন। (রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হওয়ার শোক বিহবল অবস্থায় তাঁহারই স্থানে দাঁড়াইয়া নামায পড়াইবেন ইহা আবু বকরের পক্ষে সম্ভব হইবে না বিধায়) তিনি ওমর (রাঃ)-কে বলিলেন, আপনি লোকদের নামায পড়াইয়া দিন। ওমর (রাঃ) অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আপনিই এই কার্যের জন্য অধিক যোগ্য। সেমতে আবু বকর (রাঃ) (ঐ নামায এবং আরও) কতিপয় দিনের নামায পড়াইলেন।

১৭৩০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রোগ যাতনা বৃদ্ধি পাইলে একদা বেলাল (রাঃ) আসিয়া তাঁহাকে নামাযের ওয়াক্তের উপস্থিতি জ্ঞাত করিলেন। সেই অবস্থায় হযরত (সঃ) বলিলেন- লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য আবু বকরকে বল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তখন আরজ করিলাম, আবু বকর (নরম দিলের মানুষ; তিনি) আপনার স্থানে যখন দাঁড়াইবেন তখন আর ক্রন্দনের দরুন নামাযের কেরাত শুনাইতে সক্ষম হইবেন না, সুতরাং আপনি ওমরকে আদেশ করুন তিনি যেন লোকদিগকে নামায পড়াইয়া দেন। হযরত (সঃ) পুনরায় বলিলেন, আবু বকরকে বল লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে।

---

* ইহা হযরতের মৃত্যুর সোমবার দিনের পূর্বে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রের এশার সময়ের ঘটনা। এই বৃহস্পতিবার দিন যোহরের নামাযের সময়ও হযরত (সঃ) টবের মধ্যে গোসল করিয়াছিলেন এবং উক্ত গোসলে কিছুটা স্বস্তিবোধ করিয়া দুই জনের কাঁধে ভর করতঃ মসজিদে যাইয়া যোহরের নামাযে ইমামতি করিয়াছেন;এবং সর্বশেষ ভাষণ দান করিয়াছেন- যাহার বিবরণ ১৭২৪নং হাদীছে আছে। এই বৃহস্পতিবার দিনের পর রাত্রে এশার নামাযের পূর্বেও হযরত মসজিদে যাওয়ার সক্ষমতা লাভের আশায় পুনঃ পুন ঃ গোসল করিয়াছিলেন; কিন্তু এইবার গোসলের দ্বারা স্বস্তি আসে নাই এবং মসজিদে যাইতেও সক্ষম হন নাই।

আলোচ্য হাদীছে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। এই এশার ওয়াক্ত হইতেই আবুব বকর (রাঃ)-এর ইমামতি আরম্ভ হয় এবং পর দিন শুক্রবারের পাঁচ ওয়াক্ত তার পর দিন শনিবারের ফজর কিম্বা তার পর দিন রবি বারের ফজর পর্যন্ত আবু বকরের ইমামতি চলিতে থাকে। সেই শনি বা রবিবার দিন যোহরের নামাযের ওয়াক্তে নবী (সঃ) কিছুটা স্বস্তিবোধ করিয়া দুই জনের কাঁধে ভর করিয়া মসজিদে যান এবং আবু বকর (রাঃ)-কে মোকাব্বের রাখিয়া জোহর নামাযের ইমামতি করেন- যাহার বয়ান ১৭৩১ নং হাদীছে রহিয়াছে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আমি (ওমরের কন্যা উম্মুল মোমেনীন) হাফসাকে বলিলাম, আপনি যাইয়া হযরতের নিকট বলুন, আবু বকর আপনার স্থানে দাঁড়াইলে ক্রন্দনের দরুন লোকদিগকে কেরাত শুনাইতে সক্ষম হইবেন না। অতএব আপনি ওমরকে আদেশ করুন, তিনি যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। হাফসা (রাঃ) হযরত (সঃ)-কে ঐরূপ বলিলেন! (এইরূপে তিন-চারি বার হযরতের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করা হইলে অবশেষে বিরক্ত হইয়া) রসূলুল্লাহ (সঃ) (রাগতঃ স্বরে) বলিলেন, তোমাদের অবস্থা ঐ নারীদের ন্যায়, যাহারা ইউসুফ (রাঃ)-কে তাঁহার অভিরুচির বিপরীত বিবি জোলায়খার অভিপ্রায়ের কাজ করিতে বলিতেছিল। (তোমাদের অপচেষ্টা ত্যাগ কর) আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে বল।

হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলিলেন, আপনার পরামর্শে কোন কাজ করিয়া কখনও আমি ভাল ফল লাভ করিতে পারি নাই।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের এক বা দুই দিন পূর্বে

রোগ যাতনা বৃদ্ধির দরুন উপরোল্লিখিত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে এশার নামায হইতে আবু বকর (রাঃ) দ্বারা ইমামতির কার্য চালাইবার ব্যবস্থা স্বয়ং হযরত (সঃ) করিয়াছিলেন। সেমতে আবু বকর (রাঃ) প্রতি ওয়াক্তে ইমামতি করিয়া যাইতে লাগিলেন, হযরত (সঃ) মসজিদে তশরীফ আনিতে পারিতেছিলেন না।

পরবর্তী শনিবার বা রবিবার দিন যোহরের নামাযের সময় আবু বকর (রাঃ) ইমাম হইয়া নামায আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন; এমতাবস্থায় হযরত (সঃ) কিছুটা স্বস্তিবোধ করিলেন। তৎক্ষণাত আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)-কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের উভয়ের কাঁধে ভর করতঃ হযরত (সঃ) মসজিদে তশরীফ আনিলেন এবং ইমাম আবু বকরের বাম পার্শ্বে বসিয়া নামাযের ইমামতি করিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পক্ষে মোকাব্বেরের কার্য চালাইলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২০১)

(নামায আরম্ভ হওয়ার পর এই ব্যবস্থা একমাত্র হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে জায়েয ছিল, অন্য কাহারও পক্ষ সিদ্ধ নহে।)

১৭৩১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৪) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রোগ যাতনা বৃদ্ধিকালে আবু বকরকে নামায পড়াইবার আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অতপর (একদা) হযরত (সঃ) কিছুটা স্বস্তিবোধ করিলেন* এবং স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে আসিলেন, তখন আবু বকর (রাঃ) ইমাম হইয়া লোকদের নামায পড়াইতে ছিলেন। হযরতের প্রতি আবু বকরের দৃষ্টিকোণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর (রাঃ) ইমামতির স্থান হইতে পিছনে চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। অতপর হযরত (সঃ) আবু বকরের বরাবরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তখন (মূল ইমাম হযরত (সঃ) হইলেন) আবু বকর প্রত্যক্ষ্যরূপে হযরতের একতেদা করিতেছিলেন, আর অন্যান্য লোকগণ আবু বকরের অনুসরণ করিয়া যাইতেছিল।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা ঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে দিন রবিবার (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২০২) এই ঘটনা ঘটিল যে, সকাল বেলা হযরতের রোগকে নিউমোনিয়া সাব্যস্ত করিয়া উহার জন্য কোন পানীয় ঔষধ তাঁহার মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইল। হযরত (সঃ) ঐরূপ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু

* মানুষের অন্তিম রোগ সাধারণতঃ প্রকট হইয়া উঠার পর কিছুটা স্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তারপর হঠাৎ ঐ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া চরম অবনতি দ্রুত আসিয়া যায় এবং অনতিবিলম্বে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হযরতের এই স্বস্তিবোধও এই শ্রেণীরই ছিল। বৃহস্পতিবার হইতে রোগ যাতনা প্রকট হওয়ার পর শনিবার বরং খুব সম্ভব রবিবার দুপুরে এই স্বস্তিবোধ পরিলক্ষিত হইল এবং রাত্রিও এই স্বস্তিবোধেই অতিবাহিত হইল। পরবর্তী দিন সোমবার ভোর বেলা ত ঐ স্বস্তিবোধ অধিক দৃষ্ট হইল, এমনকি আবু বকর (রাঃ)-সহ অনেকে নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই দ্রুত অবস্থার চরম অবনতি ঘটিল এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হযরত (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ভক্তগণ উক্ত নিষেধাজ্ঞাকে ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিতৃষ্ণা মনে করিয়া হযরতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঔষধ তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিল। হযরত (সঃ) তাহাদের এই কার্যের শাস্তি দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৭৩২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রোগ যাতনায় চৈতন্যহীনের ন্যায় হইয়া পড়িলেন,) আমরা তাঁহার মুখে (নিউমোনিয়ার) ঔষধ ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইলাম। তিনি ইশারা দ্বারা ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। আমরা মনে করিলাম, ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিতৃষ্ণার দরুন এই নিষেধাজ্ঞা; তাই আমরা বারণ রহিলাম না। অতপর হযরতের পূর্ণ চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে পর তিনি বলিলেন, মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম নহে কি? আমরা আরজ করিলাম, তাহা ত ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিতৃষ্ণা। হযরত (সঃ) বলিলেন, গৃহে উপস্থিত প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দাও– আমার সম্মুখে ঐরূপ কর, আমি যেন তাহা দেখিতে পাই। অবশ্য আব্বাসকে রেহাই দিও, কারণ তিনি ঐ সময় গৃহে উপস্থিত ছিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে ব্যথাদায়ক ও উত্ত্যক্তজনক কোন ব্যবহার করা হইলে সেখানে আল্লাহর তরফ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা দেখা দেয়, এমনকি ঐরূপ ব্যবহার না বুঝিয়া ভুলবশতঃ করা হইলেও তাহার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য অনেক সময় আল্লাহর ওলীদের সাধারণ স্বভাব উদারতার বিপরীতে তাঁহাদের দ্বারা ঐরূপ স্থলে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। বস্তুতঃ ইহা সাধারণ লোকদের পক্ষে অতিশয় কল্যাণজনক ব্যবস্থা। কারণ ওলী যদি স্বয়ং প্রতিশোধ গ্রহণ না করিতেন তবে হযত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাহা গ্রহণ করা হইত; আর আল্লাহর তরফ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ সামান্য পরিমাণের হইলেও বস্তুতঃ তাহা হইবে অতিশয় কঠোর ও কঠিন। তাই ওলীগণ এইরূপ স্থলে দয়াপরবশ হইয়া মানুষকে আল্লাহর প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে রক্ষা করার উদ্দেশে দ্রুত নিজেরাই প্রতিশোধ লইয়া থাকেন।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে এস্থলে ছাহাবীগণ ঐ ধরনের ব্যবহারই করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুল বুঝিয়া হযরতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলেন, যদ্দরুন হযরত রাগান্বিত এবং বিরক্ত হইয়াছিলেন। হযরতকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিশোধ আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে লওয়া হইলে তাহা হইত ভয়ঙ্কর, তাই হযরত (সঃ) ছাহাবীদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দ্রুত নিজেই প্রতিশোধ নিয়াছিলেন।

হযরত (সঃ)-কে যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা ছিল "উদে হিন্দী"– কুড়চি বা গিরিমল্লিকা গাছের কাষ্ঠ ও যাইতুন তৈল। এই বস্তুদ্বয় সাধারণভাবে কাহারও পক্ষে ক্ষতিকারক নহে, তাই প্রতিশোধ গ্রহণে ঐ বস্তুই সকলের মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইল। উম্মুল মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ)ও ঐ লোকদের একজন ছিলেন, তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন, তাঁহার নফল রোযা ভঙ্গ করাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছিল।

এই রবিবার দিনই হযরত (সঃ) ঐতিহাসিক ওসামা বাহিনীকে রোমের দিকে প্রেরণ করতঃ বিদায় দান করিয়াছিলেন। যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খণ্ডে বর্ণিত হয়িাছে।

কন্যা ফাতেমার সহিত গোপন আলাপ

১৭৩৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫১২) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (হযরতের অন্তিমকালে তাঁহার বিবিগণ সকলেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমতাবস্থায়) ফাতেমা (রাঃ) হযরতের নিকট আসিলেন। ফাতেমার চাল-চলন হুবহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাল-চলনের ন্যায় ছিল।

ফাতেমা নিকট আসিলে পর নবী (সঃ) তাঁহাকে মারহাবা বলিলেন এবং শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া চুপি চুপি কিছু বলিলেন; ফাতেমা ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি মনে মনে ভাবিলাম, ফাতেমা কাঁদে কেন? অতপর চুপি চুপি তাঁহাকে কিছু বলিলেন; তাহাতে ফাতেমা হাসিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, হাসি-কান্না উভয়ের এইরূপ সম্মিলন আর কোন দিন দেখি নাই। আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত (সঃ) কি বলিয়াছেন? ফাতেমা বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কথা গোপনে বলিয়াছেন তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না।

তারপর হযরত (সঃ) ইহজগত ত্যাগ করিয়া গেলে পর ফাতেমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ফাতেমা বলিলেন, প্রথম বারে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর জিব্রাঈল (আঃ) আমার সঙ্গে একবার কোরআন শরীফ দওর করিয়া থাকিতেন, এই বৎসর দুই বার দওর করিয়াছেন; মনে হয় আমার অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। (আমি এই রোগেই ইহজগত ত্যাগ করিব) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমিই সর্বাগ্রে আমার সঙ্গে মিলিত হইবে (আমার পরে সর্বাগ্রে তোমারই মৃত্যু ইহবে)।

(ফাতেমা (রাঃ) বলেন, হযরতের মৃত্যু নিকটবর্তী) ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিয়াছি। তখন হযরত (সঃ) আমাকে বলিয়াছেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি বেহেশতবাসী মেয়েদের সর্দার হইবে? এই সুসংবাদ শুনিয়া হাসিয়াছি।

১৭৩৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৮) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্তিম শয্যায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে চুপি চুপি কিছু বলিলেন, তাহাতে ফাতেমা কাঁদিয়া উঠিলেন। পুনরায় চুপি চুপি কিছু বলিলেন, তাহাতে তিনি হাসিলেন।

আমরা ফাতেমাকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইয়াছেন যে, প্রথম বারে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন, তিনি এই রোগেই ইহজগত ত্যাগ করিবেন; তাই আমি তখন কাঁদিয়াছিলাম। আর দ্বিতীয় বারে বলিয়াছিলেন, (তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ বেশী দিনের নহে,) তুমি আমার পরিজনের মধ্য হইতে সর্বাগ্রেই আমার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে; এই সংবাদে আমি হাসিয়াছি।

শাহাদতের মর্তবা লাভ

মাথা ব্যথা ও জ্বরই ছিল হযরতের অন্তিম শয্যার সূচনা এবং মূল পীড়া। কিন্তু পরে উহার সঙ্গে আরও একটি পুরাতন উপসর্গ যোগ হইয়া গিয়াছিল। বহু দিন পূর্বে একবার ইহুদীগণ হযরত (সঃ)-কে খাদ্যের সঙ্গে বিষ দিয়াছিল; যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খণ্ড খায়বর যুদ্ধের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তাআলার কুদরতে এত দিন হযরতের উপর সেই বিষের পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল না; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে উক্ত বিষের ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। যেহেতু এই বিষ শত্রুগণ কর্তৃক প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহার প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাই হযরত (সঃ) শাহাদতের মর্তবা লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ উপায়ে হযরতের শাহাদত হইলে তাহা মুসলমানদের পক্ষে কলঙ্ক হইত, তাই আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীবের পক্ষে শাহাদতের ন্যায় বড় মর্তবা লাভের জন্য উক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৭৩৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৭) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় বলিয়া থাকিতেন, হে আয়েশা! খায়বর দেশে ইহুদীদের দাওয়াতে যে বিষ মিশ্রিত খাদ্য খাইয়াছিলাম এখন তাহার প্রতিক্রিয়া ও কষ্ট-যাতনা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি, এমনকি মনে হইতেছে তাহার চাপে আমার হৃদতন্ত্রী বা অন্তর-রগ ছিন্ন হইয়া যাইবে।

জীবনের সর্বশেষ দিন

সোমবার দিন আজ। হযরত ইহজগত ত্যাগ করিয়া যাইবেন, কিন্তু আজ নবী (সঃ) অবিচলিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিয়াছেন। মসজিদে লোকগণ আবু বকরের (রাঃ) ইমামতিতে ফজরের নামায আদায়

করিতেছেন। হযরত (সঃ) স্বীয় কক্ষের দরজায় আসিলেন এবং পর্দা উঠাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে আবু বকরের পিছনে সকলের সমবেত হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করতঃ সন্তুষ্টিভরে মুচকি হাসি হাসিলেন। সেই বিবরণই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৭৩৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৩, ৯৪ ও ৬৪০) আনাছ (রাঃ)– যিনি দীর্ঘ দশ বৎসর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন এবং হযরতের খেদমত করিয়াছেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি এশার নামায হইতে শুক্র, শনি, রবি) তিন দিন হযরত (সঃ) নামাযের জন্য মসজিদে আসিতে পারিতেছেন না (আবু বকর (রাঃ) নামায পড়াইতেছেন)। সোমবার ভোরে মুসলমানগণ মসজিদে ফজরের নামায আদায় করিতেছেন; আবু বকর (রাঃ) তাহাদের ইমামতি করিয়াছিলেন। হঠাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) (তাঁহার অবস্থানস্থল) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কক্ষের দরজার পর্দা উঠাইয়া (কক্ষ সংলগ্ন মসজিদে) লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। (হযরতের চেহারা মোবারক রুক্তহীনতার দরুন কাগজের মত সাদা দেখাইতেছিল।) লোকগণ তখন কাতার বাঁধিয়া নামায আদায় করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হযরত (সঃ) মুচকি হাসি হাসিতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) হযরতের অগ্রসর হওয়া অনুভব করিতে পারিলেন এবং ইমামতির স্থান ত্যাগ করিয়া মোক্তাদীদের কাতারে মিলিত হইবার জন্য পিছনের দিকে পিছপা চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। কারণ, তিনি ভাবিলেন, হযরত (সঃ) মসজিদে তশরীফ আনিবেন। মোক্তাদীরা ত হযরতের মসজিদে আগমন অনুভবে অধিক খুশী হইয়া নামায ভঙ্গ করার উপক্রম করিয়া বসিল। হযরত (সঃ) হাতের ইশারায় আদেশ করিলেন, তোমরা নামায পুরা করিয়া লও; এই বলিয়া হযরত (সঃ) পর্দা ছাড়িয়া দিলেন এবং কক্ষের ভিতরে চলিয়া গেলেন। ঐদিনই হযরতের ইন্তেকাল হইয়া গেল, হযরত (সঃ)-কে পুনঃ দেখার সুযোগ আর হইল না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ জীবনের শেষ সময়ে মৃত্যুর মুখে আসিয়া অনেক সময় মানুষ কিছুটা সুস্থ হইয়া দাঁড়ায়; রবিবার দুপুর হইতে সোমবার ভোর পর্যন্ত হযরত (সঃ)-এর সেই অবস্থা চরমে উপনীত হইয়াছে। সাধারণভাবে লোকগণ হযরতের এই স্বস্তির পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এমনকি আবু বকর (রাঃ) এই দিনই হযরত (সঃ)-কে সুস্থ দেখিয়া ফজর নামাযান্তে হযরতের অনুমতি লইয়া মদীনা শহরের দূর প্রান্তে অবস্থিত এক স্ত্রীর আবাস গৃহে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা বৃহস্পতিবার হইতে হযরতের অবস্থার অবনতি দৃষ্টে হযরতের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, আজ তাঁহারাও অনেকে চলিয়া গেলেন।

অবশ্য হযরতের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি চাচা আব্বাস (রাঃ) হযরতের চেহারা মোবারক দেখিয়া পরিণতি কিছুটা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

১৭৩৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট হইতে তাঁহার রোগ অবস্থায় চলিয়া আসিলেন। লোকগণ আলী (রাঃ)-কে হযরতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। আলী (রাঃ) বলিলেন, আলহামদু লিল্লাহ– হযরত (সঃ) একটু সুস্থতার মধ্যে রাত্রি প্রভাত করিয়াছেন। তখন আব্বাস (রাঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাত ধরিয়া নিয়া গেলেন এবং বলিলেন, খোদার কসম! তুমি তিন দিন পরেই (অচিরেই) অন্যের লাঠি দ্বারা পরিচালিত হইবে। খোদার কসম আমার ধারণা এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এই রোগেই মৃত্যুবরণ করিবেন। আমি আবদুল মোত্তালেবের বংশধরগণের মৃত্যু সময়কালীন চেহারার অবস্থা ভালরূপেই ঠাহর করিতে পারি। সুতরাং তুমি আমাকে নিয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট চল। আমরা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করি, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনের দায়িত্ব কাহাকে বহন করিতে হইবে?

যদি সেই দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করেন তবে তাহা আমরা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া রাখিব, যাদি অন্যদের কথা বলেন তবে তাহাও জানিয়া রাখি এবং হযরত (সঃ) আমাদের সম্পর্কে একটা অসিয়তনামা লিখিয়া দিয়া যাইবেন।

আলী (রাঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি আমাদের সম্পর্কে "না" বলিয়া দেন তবে ত আর সেই অধিকার লাভের জন্য লোকদের নিকট দাঁড়াইবারও কোন সুযোগ আমাদের থাকিবে না। অতএব আমি ঐ বিষয়ে কোন কথা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিব না।

জীবনের শেষ মুহূর্ত

সোমবার দিন দুপুর হওয়ার পূর্বেই হযরতের অবস্থার ভয়ানক অবনতি ঘটিল। উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) নিকটেই ছিলেন। মৃত্যুর স্বাভাবিক যাতনার মধ্যে হযরতের শেষ মুহূর্তগুলি কাটিতেছিল।

১৭৩৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন রোগের ভীষণ চাপে অত্যধিক কাতর হইয়া পড়িয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ চেতনা হারাইয়া ফেলিতেছেন, তখন ফাতেমা (রাঃ) চীৎকার করিয়া উঠিলেন হায়! আমার পিতার কী কষ্ট! নবী (সঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে বলিলেন, আজিকার এই অল্প সময়ের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট-ক্লেশ থাকিবে না।

নবীজী (সঃ)-এর শেষ মুহূর্ত ফুরাইয়া গেলে ফাতেমা (রাঃ) কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, আ.. হ্! আমার পিতা প্রভুর ডাকে চলিয়া গিয়াছেন। আ...হ্! আমার পিতা ফেরদাউস বেহেশতের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। আ...হ্! আমার পিতার শোক-সংবাদ জিব্রাঈলও অবগত হইয়াছেন। (আর ত তিনি ওহী নিয়া আসিবেন না!)

নবীজীর দেহ মোবারক সমাধিস্থ করা হইলে ফাতেমা (রাঃ) শোকাভিভূত স্বরে বলিলেন, হে আনাছ! তোমাদের প্রাণ কিভাবে সহ্য করিল যে, তোমরা আল্লাহর রসূলকে মাটির আড়াল করিয়া দিলে!

বিশিষ্ট তাবেয়ী সাবেত (রঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিতে এইরূপ কাঁদিতেন যে, তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিত। (বোদায়া, ৪-২৭৩)

১৭৩৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি আমারই বুকের সঙ্গে হেলান দেওয়া ছিলেন, তাঁহার মাথা আমার সিনা ও থুতির মধ্যস্থলে ছিল। আমি তাঁহার মৃত্যু যাতনা দেখিবার পর কাহারও পক্ষে মৃত্যু যাতনা অশুভ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

১৭৪০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহি অসাল্লাম স্বীয় পিঠ দ্বারা আমার প্রতি ভর লাগাইয়া ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাঁহার প্রতি কান লাগাইয়া শুনিতে পাইলাম তিনি বলিতেছেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দাও, আমার প্রতি রহমত কর এবং আমাকে ঊর্ধ্ব জগতের বন্ধুর সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দাও।

১৭৪১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৮) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট শুনিয়া থাকিতাম, কোন নবীকে দুনিয়া এবং আখেরাতের উভয় জেন্দেগীর যেকোন একটা অবলম্বন করার পূর্ণ এখ্তিয়ার দেওয়ার পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

হযরত (সঃ) যখন রোগ শয্যায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় উপনীত হইলেন তখন এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করিতেছিলেন-

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ـ

অর্থ ঃ যাঁহাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ করুণা রহিয়াছে– নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং বিশেষ নেক বান্দাগণ তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতে চাই; তাঁহারাই হইতেছেন অতি উত্তম সঙ্গী।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরতের মুখে এই আয়াত শ্রবণে আমি বুঝিতে পারিলাম, হযরত (সঃ)-কে সেই এখ্‌তিয়ার দেওয়া হইয়াছে। (তিনি আখেরাতের জেন্দেগীই গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন।)

১৭৪২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৮) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সুস্থ থাকাবস্থায় বলিয়া থাকিতেন, কোন নবীর মৃত্যু হয় না যাবত তাঁহাকে বেহেশতের বাসস্থান দেখাইয়া (দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জেন্দেগীর) এখ্‌তিয়ার বা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা না হয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত (সঃ) যখন রোগশয্যায় জীবনের শেষ মুহূর্তে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার মাথা আমার উরুর উপর ছিল এবং তিনি চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতপর যখন তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন উর্ধ্ব দিকে তাকাইয়া বলিলেন, اللهم فى الرفيق الاعلى "হে আল্লাহ! উর্ধ্ব জগতের বন্ধুগণের সঙ্গে শামিল হইতে চাই।"

এতদশ্রবণে আমি বুঝিয়া নিলাম, এখন আর হযরত (সঃ) আমাদের মধ্যে থাকিবেন না এবং ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, হযরত (সঃ) সুস্থাবস্থায় যাহা বলিয়া থাকিতেন ইহা তাহারই তাৎপর্য।

১৭৪৩। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন সময় অসুস্থতা বোধ করিলে কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বি রাব্বিন নাস– এই সূরাদ্বয় পাঠ করতঃ উভয় হস্তে ফুৎকার মারিয়া হস্তদ্বয় সর্বশরীরে বুলাইয়া দিতেন।

হযরত (সঃ) যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইলেন তখন (নিজে ঐরূপ করিতেন না,) আমি উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করতঃ হযরতের হস্তদ্বয়ে ফুৎকার মারিতাম এবং তাঁহার শরীরে বুলাইয়া দিতাম।

নবীজীর (সঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তের আর একটি সতর্কবাণী বিশেষ অনুধাবনযোগ্য– যাহা প্রথম খণ্ডে অনূদিত হইয়াছে; ২৭৮ নং হাদীছ।

১৭৪৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪০) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার উপর আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ নেয়ামত এই হইয়াছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন আমার গৃহে, আমার জন্য নির্ধারিত দিনে এবং আমার (বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায়) সিনা ও থুতির মধ্যস্থলে থাকিয়া। তদুপরি শেষ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা হযরতের এবং আমার থুথু একত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন– যাহার ঘটনা এই–

আমার ভ্রাতা আবদুর রহমান হাতে তাজা একটি মেসওয়াকের ডালা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল; তখন আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আমার বুকের সঙ্গে হেলান দেওয়াইয়া রাখিলাম। আমি লক্ষ্য করিলাম, হযরত (সঃ) আবদুর রহমানের প্রতি বিশেষভাবে তাকাইতেছেন; তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মেসওয়াকের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমি হযরত (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ মেসওয়াক আপনার জন্য লইব কি? হযরত (সঃ) মাথার দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন, হাঁ। আমি মেসওয়াক নিয়া হযরত (সঃ)-কে প্রদান করিলাম। তাহা চিবান তাঁহার পক্ষে কঠিন হইা দাঁড়াইল; সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা কলিাম, আমি ইহাকে চিবাইয়া নরম করিয়া দিব কি? হযরত (সঃ) মাথা দ্বারা ইশারা করিয়া হাঁ বলিলেন। আমি মেসওয়াকটি লইয়া ভালভাবে চিবাইলাম (এবং ঝাড়িয়া সুন্দররূপে পরিষ্কার করতঃ হযরত (সঃ)-কে প্রদান করিলাম) অতপর হযরত (সঃ) এমন সুন্দরভাবে দাঁত মর্দন করিলেন যে,

ঐরূপ আর কখনও দেখি নাই। হযরত (সঃ) উহাদ্বারা মিসওয়াক করিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে একটি পাত্রে পানি ছিল। হযরত (সঃ) বার বার স্বীয় হস্তদ্বয় পানির মধ্যে ভিজাইয়া তাহা দ্বারা মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ـ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; মৃত্যুর যাতনা অনেক।"

অতপর উপরের দিকে হস্ত উত্তোলন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "উর্ধ্ব জগতের বন্ধুর সঙ্গে মিলন চাই।" এই বলিতে বলিতে হস্ত মোবারক শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল এবং তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ ـ

জীবন সায়াহ্নে কতিপয় বাণী

১। জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে বলিতে শুনিয়াছি– আল্লাহর প্রতি তোমরা ভাল ধারণা রাখিও। তোমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু যেন এই অবস্থায় হয় যে, আল্লাহ তাআলার প্রতি ভাল ধারণা থাকে। (বোদায়া, ৪–২৩৮)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলার প্রতি ভাল ধারণা তথা তাঁহার রহমত লাভের আশা পোষণ করা তখনই সম্ভব হইবে যখন আমল ভাল হয়। সাধ্যানুসারে বা সাধারণ পর্যায়ে ভাল আমল করিয়াও অনেকের মতে আল্লাহর আযাবের আতঙ্ক ও ভীতির প্রাবল্য থাকে; তাঁহাদের প্রতি নবীজীর উপদেশ– মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা প্রবল রাখিবে।

২। আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্তসমূহে পুনঃ পুনঃ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া থাকিতেন–

নামায, নামায– সাবধান!
দাস-দাসীদের প্রতি সাবধান!!

আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে আদেশ করিলেন কোন একটি প্রশস্ত বস্তু আনিতে, যাহাতে তিনি এমন বিষয় লিখিয়া যাইবেন যাহা পাওয়ার পর উম্মত গোমরাহ হইবে না।

আলী (রাঃ) বলেন, আমার ভয় হইল যে, আমি দূরে গেলে হয়ত নবীজীর শেষ নিঃশ্বাসের সময়টুকু হারাইয়া বসিব। তাই আমি আরজ করিলাম, আমি স্মরণ রাখিব এবং সযত্নে কণ্ঠস্থ করিয়া লইব। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তোমাদিগকে শেষ উপদেশ দিতেছি– নামায এবং যাকাত, আর দাস-দাসীদের প্রতি সদয় থাকিও।

উম্মুল মোমেনীন বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাসের বেলায়ও বলিতেছিলেন, নামায এবং দাস-দাসী। এমনকি তাঁহার জবান চলে না, তবুও তাঁহার কণ্ঠণালীর মধ্যে ঐ কথার গরগর শব্দ শ্রুত হইতেছিল। (নাসায়ী শরীফ,) বেদায়া, ৪–২৩৮।

৩। আয়েশা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– (যাহা প্রথম খণ্ডে ২৭৭ নং হাদীছে অনূদিত হইয়াছে), নবীজী (সঃ) যখন মৃত্যু যাতনায় অস্থির ছিলেন, যদ্দরুন মুখমণ্ডল একবার চাদরে আবৃত করিতেছিলেন আর একবার উন্মুক্ত করিতেছিলেন, এইরূপ অস্থিরতার মধ্যে নবীজী (সঃ) স্বীয় উম্মতকে কবরের সেবা ও শ্রদ্ধার নামে কবর পূজা হইতে সতর্ককরণার্থ বলিতেছিলেন, ইহুদী ও নাসারাদের উপর লা'নত, তাহারা তাহাদের নবীগণের এবং নেককার ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল।